আধুনিক কালের বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি

উৎস ও ইতিহাস, ব্যবচ্ছেদ ও প্রতিকার

ইমরান রাইহান
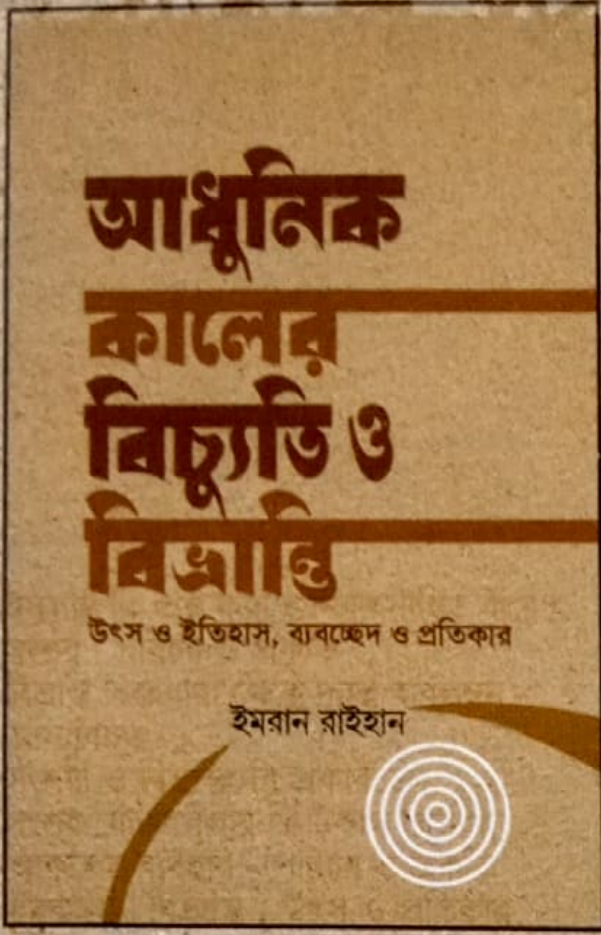
সমাজে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ছে নানা সংশয়। হাজার বছরের পুরনো নানা মতবাদ হাজির হচ্ছে নতুন মোড়কে। সেক্যুলারধারায় গড়ে-ওঠা প্রজন্ম এ সব সংশয় লুফে নিচ্ছে খুব দ্রুত। কেউ পা বাড়াচ্ছে নাস্তিকতার দিকে, কেউ অস্বীকার করছে হাদিসের প্রামাণ্যতা, কেউ শরিয়ার ব্যাখ্যা করছে হাজার বছরের ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রকে পাশ কাটিয়ে—সব মিলিয়ে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি! সব সংশয় ও বিভ্রান্তির গতি-প্রকৃতিও এক নয়; কোনোটা আসছে শরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে, কোনোটা আবার শরিয়া পালনের নামে! এ সব বিভ্রান্তি ও সংশয়ের উৎস চেনা না গেলে প্রতিকার নির্ণয় করার কাজটি হয়ে উঠবে দুরূহ!

লেখকের কথা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমার নিজস্ব কোনো মৌলিক রচনা নয়, বরং একাধিক আলেমের লেখা ও বক্তব্যের সংকলনমাত্র। মডার্নিজম ও পোস্ট মডার্নিজমের হাত ধরে গত দেড় শতাব্দী যাবৎ মুসলিমবিশ্বে ছড়ানো হচ্ছে নানা বিভ্রান্তি। কখনও ধর্মকে সরাসরি অস্বীকার করা হচ্ছে, কখনও এর সীমা প্রভাবকে সংকুচিত করা হচ্ছে, কখনও হাজির করা হচ্ছে শরিয়ার বিকৃত ব্যাখ্যা। নসকে উপস্থাপন করা হচ্ছে ভুলভাবে, কিছু ক্ষেত্রে করা হচ্ছে আড়াল। ফলে শরিয়ার যে চিত্র দাঁড়াচ্ছে, তা সালাফে সালেহিনের যুগে ছিল না; এমনকি হয়তো তারা এই চিত্র দেখলেও আঁতকে উঠতেন! মুসলিম-সমাজের মডার্নিস্ট অংশটি এই বিকৃতির পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী। নিজেদেরকে মুজতাহিদের আসনে বসিয়ে তারা ঘোষণা করে চলেছে একের পর এক মতামত। ইসলামি তুরাসের সাথে নিজেদের জাহালতপূর্ন বিরোধকেও তারা ইজতিহাদের মর্যাদা দিতে চায়, অথচ তাদের মতগুলোর ইলমি তানকিদ এলে সেটা আর মেনে নিতে পারে না! একে অভিহিত করে অজ্ঞতা, সেকেলে ইত্যাদি বলে।

মডার্নিস্টরা সারা বিশ্বেই নিজেদের বিকৃত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস প্রচার করে চলেছে। সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে নিজেদের চিন্তা ছড়াতে পারছে সর্বত্র। বাংলাদেশে বসে এমন মানুষের অনুসরণও করা হচ্ছে, যার ব্যাপারে তার অঞ্চলের আলেমরাই মানুষকে সতর্ক করেছেন, তার বিভ্রান্তি চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এ সবের দিকে তাকানোর সময় নেই কারও! অনলাইনে নতুন কিছু আসা মানেই শত ভাগ সঠিক, এমন এক বালখিল্য ধারণা গেঁথে আছে অনেকের মনে।

আরববিশ্বের আলেমরাও এ সব নতুন নতুন চিন্তা ও বিভ্রান্তি নিয়ে ভাবছেন। এর প্রতিকারে তারা লেখালেখি করছেন, বক্তব্য রাখছেন, প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এ ধারায় ডক্টর সামি আমেরি, শায়খ ফাহাদ আজলান, ড. মুতলাক আল-জাসির, শায়খ ইবরাহিম সাকরান, শায়খ আহমদ ইউসুফ আস-সাইয়েদ, বুস্তামি মুহাম্মদ সাইদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের একাধিক লেখা ও আলোচনার সারনির্যাস তুলে ধরেছি এই বইয়ে। বিভিন্ন

বইপত্র ও আলোচনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের আলোচনাগুলো বিন্যস্ত করেছি, কোথাও কিঞ্চিৎ সংক্ষেপিত হয়েছে, কোথাও কিছুটা পরিমার্জন করা হয়েছে। এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এ সবই তাদের ইলমের নির্যাসমাত্র।

আমার অযোগ্যতা ও কমজোরির কারণে বইতে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কারও চোখে এমন ভুল ধরা পড়লে জানানোর অনুরোধ রইল। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন বইটি কবুল করেন এবং আমার নাজাতের উসিলা বানান।

ইমরান রাইহান

মিরপুর, ঢাকা

১০/০৯/২০২৩

সূচিপত্র

ইসলাম কি প্রশ্ন করতে নিরুৎসাহিত করে?

প্রগতিশীল বলে পরিচিত অনেকেই বলে বেড়ায়, ইসলাম মানুষের চিন্তার দরজা আটকে দেয়। মানুষকে প্রশ্ন করতে নিরুৎসাহিত করে। এখানে আছে শুধু অন্ধ অনুসরণ, নেই কোনো গবেষণা বা অনুসন্ধান। মূলত তাদের এ ধরনের বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ সবের মাধ্যমে তারা সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালায়।

ইসলাম কখনওই মানুষকে প্রশ্ন করতে নিরুৎসাহিত করেনি কিংবা প্রশ্নকে নিষিদ্ধ করেনি। আল্লাহ তায়ালা নিজে কুরআনুল কারিমে মানুষকে আদেশ করেছেন, তারা যদি কোনো কিছু না জানে, তা হলে যারা জানে, তাদেরকে যেন প্রশ্ন করে—

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহি পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও প্রশ্ন করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'অজ্ঞতার প্রতিষেধক হল প্রশ্ন করা।'[২] ইবনে আবদুল বার আন্দালুসি রহ. এই হাদিস উল্লেখ করে বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হল, যখন সে দ্বীনের কোনো বিষয়ে অজ্ঞ থাকবে, তখন প্রশ্ন করে জেনে নেবে।'[৩]

---

১. সুরা নাহাল, ৪৩

২. *আবু দাউদ*, ৩৩৭

৩. *আত-তামহিদ*, ৮/৩৩৮

যদি ইতিবাচক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করা হয় এবং শুধু জানাই উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ইসলাম প্রশ্ন করতে কাউকে বাধা দেয় না। এর সবচেয়ে মজবুত দলিল হল, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা অনেক প্রশ্ন উল্লেখ করে এর জবাব দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ কিছু আয়াত দেখা যাক—

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দুটোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর এর পাপ এর উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তারা কী ব্যয় করবে?' বলো, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।' এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।[১]

অন্য আয়াতে এসেছে—

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে এতিমদের সম্পর্কে। বলো, 'সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম। আর যদি তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে মিশিয়ে নাও, তবে তারা তোমাদেরই ভাই।'[২]

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

---

১. সুরা বাকারা, ২১৯
২. সুরা বাকারা, ২২০

আর তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রুহ আমার রবের আদেশ থেকে; আর তোমাদেরকে জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেওয়া হয়েছে।[১]

আরেকটি আয়াত দেখুন—

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿۸۳﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

আর তারা তোমাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, 'আমি এখন তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট বর্ণনা দিচ্ছি।' আমি তাকে জমিনে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং সব বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।[২]

এ ধরনের আরও আয়াত আছে, যা সামনে রাখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইসলাম প্রশ্ন করাকে নিরুৎসাহিত করেনি। শরিয়ার ব্যাপারে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন আসতে পারে, এর বড় অংশের জবাব কুরআনুল কারিম ও হাদিসে এসে গেছে। বাকি অংশের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। তারা নিজের যুগ অনুযায়ী বিবেচনা করে এ সব প্রশ্নের জবাব দেবেন।

একজন মুসলমানের মনে যখন ইসলাম সম্পর্কে, শরিয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগ্রত হয়, তখন তার কর্তব্য দুটি: এক. আল্লাহ তায়ালার প্রতি সুধারণা রাখা। তাঁর বিধানগুলোর প্রতি মনে শ্রদ্ধা রাখা। অন্তরে বিনম্র ভাব নিয়ে প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা। এমন যেন না হয়, অন্তরে কোনো প্রশ্ন আসামাত্রই তা দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এটি মানুষের বিভ্রান্তির এক বড় কারণ। প্রশ্নকেই যখন সমাধান মনে করা হয়, তখন ব্যক্তির বিভ্রান্তির মাত্রা আরও দীর্ঘ হয়। দুই. প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানে উপযুক্ত মাধ্যম গ্রহণ করা উচিত। শরিয়া সম্পর্কে মনে কোনো প্রশ্ন এলে বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হতে হবে।

---

১. সুরা বনি ইসরাইল, ৮৫

২. সুরা কাহাফ, ৮৩-৮৪

বেশির ভাগ মানুষ এখানে ভুল করেন। মনে প্রশ্ন এলে তারা দ্বারস্থ হন সেলিব্রেটি দাই কিংবা পরিচিত কোনো ব্যক্তিত্বের। যারা হয়তো বিষয়টি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন না। অনেক সময় তারা ভুল-সঠিক মিলিয়ে জবাব দেন, যা ব্যক্তির সন্দেহকে বিশ্বাসে রূপান্তর করে। ফলে আগের বিভ্রান্তিতেই ঘুরপাক খেতে থাকে তার মন।

ইসলামে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ নয়; তবে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে গ্রহণ করতে হবে সঠিক পন্থা। ইসলাম কাউকে আকলের দরজা বন্ধ করতে বলে না, চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করে না। কুরআনুল কারিমে একাধিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চিন্তা-ফিকির করতে বলেছেন—

قُلْ اِنَّمَاۤ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۟ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَیْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿۴۶﴾

বলো, 'আমি তো তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়িয়ে যাও; অতঃপর চিন্তা করে দেখো, তোমাদের সাথির মধ্যে কোনো পাগলামি নেই। সে তো আসন্ন কঠোর আজাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নয়।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ ۟ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿۸﴾

তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না, আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুই যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন? আর নিশ্চয় বহু লোক তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।[২]

---

১. সুরা সাবা, ৪৬
২. সুরা রুম, ৮

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম, তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলো পেশ করি। হয়তো তারা চিন্তা-ভাবনা করবে।[১]

কুরআনুল কারিমের অন্তত ১৮টি আয়াতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে চিন্তা-ফিকির করতে বলেছেন। চিন্তা-ফিকির যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয়, তা হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে চেনার পথ সুগম হয়। চিন্তা-ফিকির করলে মানুষ শরিয়ার অপরিহার্যতা বুঝতে পারে। তবে চিন্তা-ফিকির করতে হবে সঠিকভাবে। এলোপাথাড়ি চিন্তা মানুষকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা সঠিকভাবে চিন্তা-ফিকির করার নিয়মগুলো তুলে ধরার কিছু দিকনির্দেশনা, উপায়-উপকরণ ও পথ-পদ্ধতি বিবরণ করব, ইনশাআল্লাহ।

---

১. সুরা হাশর, ২১

সংশয় : পরিচয় ও প্রকৃতি

সংশয়ের স্বাভাবিক অর্থ হল, সত্য-মিথ্যা গুলিয়ে যাওয়া; হক ও বাতিলকে পৃথক করতে না পারা। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'সংশয় অর্থ হল, হক ও বাতিলকে পৃথক করতে না পারা। বাতিলের গায়ে হকের পোশাক পরিয়ে দেওয়া। বেশির ভাগ মানুষ বাহ্যিক সৌন্দর্যকে অনুসরণ করে। ফলে বাহ্যিকভাবে যা দেখা যায়, মানুষ তার অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু যারা ইলমের অধিকারী, তাদের দৃষ্টি প্রতিটি বিষয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও প্রত্যক্ষ করে। বাহ্যিক আবরণের নিচে যা লুকিয়ে আছে, তাও তারা ধরতে পারেন। তাদের সামনে প্রতিটি বিষয়ের হাকিকত স্পষ্ট হয়।'[১]

বাতিল বা মিথ্যা যদি তার মূল রূপে প্রকাশ পায়, তা হলে মানুষের বিভ্রান্তি কমে যায়; সহজেই সবাই বিষয়টি বুঝতে পারে। কিন্তু যখন তা হকের রূপ ধারণ করে এবং নিজেকে হক বলে প্রকাশ করে, তখন অনেক মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়। সবার ইলম ও দূরদর্শিতা এক পর্যায়ের হয় না, ফলে তাদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়। এ জন্য আমরা দেখি, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিন্দা করেছেন। কারণ, তারা হকের সঙ্গে বাতিলকে মিশ্রিত করেছে, হক গোপন করেছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

হে কিতাবিরা, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ! অথচ তোমরা তা জানো।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

---

১. *মিফতাহু দারিস সাআদাহ*, ১/৩৯৪

২. সুরা আলে ইমরান, ৭১

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

আর তোমরা হককে বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন করো না।[১]

হক ও বাতিলকে মিশ্রিত করার মাধ্যমে জন্ম নেয় নতুন নতুন সংশয়। সাম্প্রতিক কালে এর পরিমাণ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেড়েছে। দ্বীনের নামে উপস্থাপন করা হচ্ছে নতুন নতুন ব্যাখ্যা। নুসুসগুলোকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে মনগড়া পদ্ধতিতে। পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা তীব্র প্রভাবিত এক শ্রেণির গবেষক পুরো শরিয়ার কাঠামোটিই যেন আমূল বদলে ফেলতে বদ্ধপরিকর! মুখে তারা পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধিতার কথা বলেন বটে, কিন্তু তাদের বিরোধিতার আড়ালেও লুকিয়ে থাকে মুগ্ধতা! তাদের বইপত্র ও আলোচনা ইলম সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয় বেশ সাদরে। ফলে তাদের মধ্যেও দেখা যায় একের পর এক সংশয়। এ জন্য দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে নিজের দিকেও লক্ষ রাখা উচিত—নিজের অজান্তে মনে কোনো সংশয় দানা বাঁধছে কি না! যে বিষয়টিকে আমি হক মনে করছি, আসলেই তা হক কি না!

সংশয়ের কাছাকাছি আরেকটি শব্দ হল ওয়াসওয়াসা। ওয়াসওয়াসা ও সংশয়ের মধ্যে তফাত আছে। অনেকে মনে করে, তার মধ্যে সংশয় আছে; কিন্তু বাস্তবে সংশয় নেই, ওয়াসওয়াসা আছে। এ জন্য ওয়াসওয়াসা ও সংশয়ের তফাত জানাও জরুরি। ওয়াসওয়াসা মানে হল, শয়তানের কুমন্ত্রণা। অন্তরে বিভিন্ন সময় নানা নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা উদয় হয়। কারও মনে হয়, তার উজু হচ্ছে না! কারও মনে হয়, তার নামাজে ত্রুটি রয়েই যাচ্ছে, নামাজ হয়তো কবুল হচ্ছে না! এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার উদয় হওয়াকেই ওয়াসওয়াসা বলে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾

---

১. সুরা বাকারা, ৪২

আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনি হতেও অধিক কাছে।[১]

কুরআনুল কারিম থেকে জানা যায়, শয়তান হজরত আদম আলাইহিস সালামকেও ওয়াসওয়াসা দিয়েছিল—

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। বলল, আদম, আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ ও অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?[২]

ওয়াসওয়াসা নানা ক্ষেত্রে হতে পারে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, শরিয়ার ক্ষেত্রে বা ইসলামের কোনো বিধানের ক্ষেত্রে মনে ওয়াসওয়াসা আসতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ ওয়াসওয়াসাকে বাস্তবে পরিণত করা না হবে, ওয়াসওয়াসার পক্ষে কোনো কাজ বা কথা বলা না হবে, ততক্ষণ কোনো সমস্যা নেই।

---

১. সুরা কাফ, ১৬
২. সুরা ত্বহা, ১২০

বিভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে দূরত্ব অবলম্বন

বক্ষ্যমাণ বইতে আমরা সমকালীন নানা সংশয় ও সন্দেহের প্রকৃতি এবং এগুলো অপনোদনের উপায় নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা জরুরি। সাম্প্রতিক কালে সংশয় ও বিভ্রান্তির পরিমাণ যেমন বেড়েছে, তেমনি এগুলোর ব্যাপারে জানাশোনার ক্ষেত্রেও বেড়েছে মানুষের আগ্রহ। এ ক্ষেত্রে অনেকের উদ্দেশ্য হল, এ সব সংশয়-সন্দেহ সম্পর্কে জেনে এগুলোর জবাব দেওয়া। উদ্দেশ্যটি সৎ ও মহৎ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনও জরুরি। এই সন্দেহ-সংশয়গুলো একেকটি চোরাবালির মতো, যেখানে সামান্য অসতর্কতায় একজন মানুষ বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে পারে! ফলে যে কারও উচিত নয় এই বিষয়ে কাজ করা। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ, যাদের পর্যাপ্ত ইলম নেই, তাদের জন্য আবশ্যক হল, এ সব থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা এবং নির্ভরযোগ্য আলেমদের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপচারিতাও সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ নয়। কারণ, অনেক সময় নিজের স্বল্প ইলমের কারণে তিনি অনেক কিছুর জবাব দিতে পারবেন না এবং তার পরাজয়কে নাস্তিকরা প্রচার করবে ধর্মের পরাজয় হিসেবে। অনেকের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও তারা বিতর্কের কৌশল ও প্রতিপক্ষের বাকপটুতা সম্পর্কে অনবহিত থাকেন। এমন ব্যক্তিদেরও উচিত নয় এ সব বিভ্রান্তদের সঙ্গে বিতর্কে জড়ানো। এই বিষয়ে সামান্য অসতর্কতা একজন মানুষের দ্বীন ও ঈমানকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।[১]

১. এ প্রসঙ্গে আহমদ আল-উবাইদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে। উবাইদুল্লাহর বাড়ি ছিল ভারতে। সে হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বছর কয়েক আগে। এরপর নাস্তিক্যবাদ ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিল; এমনকি সমকালীন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *জবাব* বইতেও তার লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়! যেখানে শামসুল আরেফীন শক্তি, আরিফ আজাদ, রাফান আহমেদ, মুশফিকুর রহমান মিনারের মতো প্রখ্যাত লেখকরা লিখেছিলেন। কিন্তু বছর দুয়েক আগে উবাইদুল্লাহ আচমকা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়! এই লেখা যখন লিখছি,

হজরত আয়েশা রাজি. বলেন, একবার নবীজি সা. কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন—

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কিছু আয়াত 'মুহকাম'। এইগুলো কিতাবের মূল। আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ'। যাদের অন্তরে সত্য লঙ্ঘন করার প্রবণতা রয়েছে, শুধু তারাই ফেতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, 'আমরা এটা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' আর বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।[১]

এরপর নবীজি সা. বলেন, 'যারা মুতাশাবাহাত আয়াতের পিছনে ছোটে, তাদের যখন দেখবে, তখন বুঝবে এদের কথাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।'[২]

আরেকবার নবীজি সা. সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, 'যারা তাকদিরে বিশ্বাস করে না, তোমরা তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করো না এবং তোমাদেরকে সম্বোধন করার আগে তাদেরকে সম্বোধন করো না।'[১]

তখনও সে ইসলামে ফিরে আসেনি। খ্রিষ্টান মিশনারিদের মতোই খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করছে পশ্চিমবঙ্গে। উবাইদুল্লাহর পরিচিত অনেকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমি আলাপ করেছি। তাদের মতে উবাইদুল্লাহর ধর্মীয় পড়াশোনা ছিল খুবই কম। অনলাইনে বিক্ষিপ্ত পড়াশোনা করে সে খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে বিতর্ক শুরু করে। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে দলিল-যুক্তিতে না পেরে নিজের ধর্মেই সে আস্থা হারিয়ে ফেলে! উবাইদুল্লাহর ঘটনাটি দুঃখজনক! কিন্তু এখানে আমাদের জন্য শিক্ষার উপকরণ আছে।

১. সুরা আলে ইমরান, ৭

২. *বুখারি*, ৪৫৪; *মুসলিম*, ২৬৬৫

মুনাভি রহ. বলেন, 'এই হাদিসে ওঠাবসা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ, এতে তারা নিজেদের বিভ্রান্ত চিন্তা প্রচারের সুযোগ পাবে। সম্বোধন করতে নিষেধ করার অর্থ হল, তারা বিতর্ক করতে না চাইলে নিজ থেকে তাদেরকে আহ্বান করো না, যেন তোমাদের কেউ সন্দেহ বা সংশয়ের শিকার না হয়।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলেন, 'বেদআতের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাকো। মানুষের অন্তর থেকে দ্বীন একবারে বের হয় না। বরং শয়তান প্রথমে তার অন্তরে বেদআতের সূচনা করে, এরপর তার অন্তর থেকে ঈমান বের করে ফেলে। এরপর সে ধীরে ধীরে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। রাব্বুল আলামিনের বিষয়ে অযাচিত প্রশ্ন তোলে। তোমাদের কেউ যদি এমন সময় পায়, তা হলে সে যেন পলায়ন করে।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'পলায়ন করে আমরা কোথায় যাব?' ইবনে মাসউদ বলেন, 'পলায়ন করে কোথাও যাবে না। বরং পলায়ন করবে তার অন্তর থেকে, তার দ্বীন থেকে। কেউ যেন বেদআতিদের সঙ্গে না বসে।'[২]

একবার মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের কাছে দুই ব্যক্তি আসল দেখা করতে। আকিদার দিক থেকে তারা ছিল বিভ্রান্ত। মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. তাদের সম্পর্কে জানতেন। তারা বলল, 'আমরা আপনাকে একটি হাদিস বর্ণনা করতে এসেছি।' ইবনে সিরিন বললেন, 'না, আমি শুনতে চাই না।' তারা বলল, 'তা হলে আপনাকে একটি আয়াত শোনাই।' ইবনে সিরিন বললেন, 'তোমরা এখান থেকে চলে যাও, নইলে আমি নিজেই যাচ্ছি।' এই কথা শুনে সেই দু ব্যক্তি চলে গেল।[৩] ইবনে সিরিনের অভ্যাস ছিল, যখন তিনি বেদআতিদের মজলিসের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন দু হাত দিয়ে কান চেপে ধরতেন, যেন তাদের কথা কানে না আসে!

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. বলতেন, 'তোমরা কখনও বেদআতিদের সঙ্গে বসবে না। আমার আশঙ্কা হয়, এতে তোমাদের উপর লানত বর্ষণ হবে।' একবার তিনি বলেন, 'বেদআতিদের কাছে বসে খাওয়ার চেয়ে ইহুদি-নাসারার পাশে বসে খাওয়া আমার কাছে প্রিয়।'[৪]

---

১. *আবু দাউদ*, ৪৭১০; *মুসনাদে আহমদ*, ২০৬; শায়খ আহমদ শাকের এ সনদকে সহিহ বলেছেন।

২. *শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ*, ১/১৩৬

৩. *আশ-শরিয়া*, ৫৪; *সুনানে দারিমি*, ১/১২০

৪. *জাম্মুল কালাম*, ২৩৬

এক বেদআতি ব্যক্তি এসে আইয়ুব সাখতিয়ানি রহ.-কে বলেছিল, 'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' তিনি বললেন, 'অর্ধেক কথা জিজ্ঞেস করার অনুমতিও দেব না।' আবু কুলাবা আইয়ুব সাখতিয়ানিকে নসিহত করে বলেছিলেন, 'তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেবে। রাজদরবার থেকে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির অনুসারীদের মজলিসে বসবে না। আর নিজের ব্যবসা ধরে রাখবে।'[১] আইয়ুব বিন সাখতিয়ানি বলেন, 'সাইদ ইবনে জুবায়ের আমাকে তালাক বিন হাবিবের মজলিসে বসতে দেখে বলেছিলেন, 'তার কাছে বসবে না। কারণ, সে মুরজিয়া।''[২]

ইমাম আবদুর রাজ্জাক সানআনি রহ. অনেক বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক তার সংকলিত হাদিসগ্রন্থ। একবার ইবরাহিম বিন আবি ইয়াহইয়া নামে এক ব্যক্তি তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এই ব্যক্তি ছিল মুতাজিলা চিন্তার অনুসারী। সে আবদুর রাজ্জাক সানআনির সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চায়। আবদুর রাজ্জাক সানআনি জবাব দেন, 'আমি তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলব না। কারণ, মানুষের অন্তর দুর্বল।'[৩]

আতা ইবনে আবি রবাহ রহ. তার ছাত্রদের বলেছিলেন, 'যদি তার মজলিসে কোনো বিভ্রান্ত লোক বসে, তা হলে তাকে যেন জানানো হয়।'

ইবনে আউনের ঘরে একবার আমর বিন উবাইদ প্রবেশ করে। তাকে দেখে ইবনে আউন রহ. নীরব থাকেন। বেশ কিছু সময় কেটে যায় দুজনের কেউই কোনো কথা বলেননি। ইবনে আউন কথা বলবেন না বুঝতে পেরে আমর বিন উবাইদ চলে যায়। ইবনে আউন বলতে থাকেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া তাকে কে এখানে প্রবেশ করতে দিল?'[৪] ইবনে আউন তার ছাত্রদের বলতেন, 'তোমাদের কানে যেন প্রবৃত্তির অনুসারীদের কথাবার্তা না পৌঁছয়।'[৫]

ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির রহ. বলতেন, 'যদি চলার পথে তোমার সঙ্গে কোনো বিভ্রান্ত ব্যক্তির দেখা হয়, তা হলে তুমি অন্য পথ বেছে নাও।'[৬] আবু

---

১. *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ২/২৮৬।
২. *সুনানে দারিমি*, ১/১২০; *আস-সুন্নাহ*, ১/৩২৩
৩. অর্থাৎ আমি চাই না তোমার কোনো কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ি।
৪. *আল-বিদাউ ওয়ান নাহয়ু আনহা*, ৫৮
৫. *আল-ইবানাতুল কুবরা*, ২৪৬
৬. *আশ-শরিয়া*, ৬৪

ইসহাক ফিজারি বলতেন, 'ইহুদি-নাসারার ঘরে বসা আমার কাছে প্রিয়—এমন লোকদের মজলিসে বসা থেকে, যেখানে তারা বসে দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে।'[১]

আওয়াম বিন হাসাব রহ. বলেন, 'আমার ছেলে ঈসার মদ ও গান-বাজনা নিয়ে বসে থাকা আমার কাছে প্রিয়—বিভ্রান্তদের সঙ্গে বসে থাকার চেয়ে।'[২] আলি বিন ঈসার সামনে কারামিয়াদের কিছু আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'তোমরা চুপ করো। আমার এই মসজিদকে নাপাক করো না।'[৩] ঈসা বিন ইউনুস তার ছাত্রদের কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন, 'তোমরা জাহমিয়াদের মজলিসে বসা থেকে বিরত থাকবে।'[৪]

আবু বকর বিন আইয়াশ রহ. তার ছাত্রদের বলেন, 'যদি কেউ এসে তোমাকে বলে—'কুরআন মাখলুক', তা হলে তার সঙ্গে কথা বলবে না, তার মজলিসেও বসবে না।'[৫]

আবু সাদ হারাবি রহ. একবার জামে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন, লোকজন বাতিলপন্থিদের সঙ্গে বিতর্ক করছে। তিনি বললেন, 'সবাই এখান থেকে উঠে যাও; দ্বীনের মধ্যে বিতর্কের সুযোগ নেই।'[৬]

আবুজ জিনাদ রহ. বলেন, 'আমরা যে সব ফকিহ ও শ্রেষ্ঠ মানুষদের পেয়েছি, তারা আমাদের নিষেধ করেছেন প্রবৃত্তির অনুসারীদের সংস্পর্শে যেতে কিংবা তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে। এই বিষয়ে তারা আমাদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।'[৭]

গায়লান দিমাশকি সম্পর্কে মুজাহিদ রহ. বলেছিলেন, 'তোমরা তার কাছে যেও না। কারণ, সে তাকদির অস্বীকার করে।' একবার মুজাহিদ রহ. লক্ষ করলেন, তার এক শিষ্য গায়লান দিমাশকির সঙ্গে পথ চলছে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেই শিষ্যের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দেন। পরে শিষ্য জানায়, এতে তার

---

১. *আল-ইবানাতুস সুগরা*, ৮৮
২. *আল-বিদাউ ওয়ান নাহয়ু আনহা* , ৫৬
৩. *জাম্মুল কালাম*, ২৭৭
৪. *ফিকহুর রাদ আলাল মুখালিফ*, ৪১
৫. *আশ-শরিয়া*, ৭৯
৬. সম্ভবত বিশেষ বিবেচনায় ও পরিস্থিতি অনুসারে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক সময় বাতিলপন্থিদের সঙ্গে বিতর্ক করা জরুরি হয়ে পড়ে। (*জাম্মুল কালাম*, ২৭৬)
৭. *জামিউ বায়ানিল ইলম*, ২/৩৪৯

কোনো দোষ নেই! গায়লান নিজেই আগ বাড়িয়ে কথা বলতে এসেছিল। তখন মুজাহিদ রহ. শান্ত হন।[১]

তাউস ইবনে কায়সান রহ. ছিলেন ইয়েমেনের বিখ্যাত আলেম। তার কাছে বাতিল আকিদাপন্থি এক ব্যক্তি দেখা করতে আসে। সে বলে, 'আমি কি এখানে বসতে পারি?' তাউস জবাব দেন, 'তুমি বসলে আমি উঠে যাব।' সে বলে, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক। এমন করছেন কেন?' তাউস বলেন, 'তুমি বসলে আমি উঠে যাব।' এরপর সেই ব্যক্তি নিজেই চলে যায়।[২]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আজুররি, ইবনে বাত্তাহ, ইবনে আবি জামনিন-সহ আলেমদের অনেকে বাতিলপন্থিদের সঙ্গে তর্কে জড়াতে নিষেধ করেছিলেন।[৩]

বাতিলপন্থিদের ব্যাপারে আলেমদের মনে সব সময় ঘৃণা জাগ্রত ছিল। তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি রাখতেন না তারা। উদাহরণ হিসেবে গায়লান দিমাশকির কথা বলা যায়। মাবাদ জুহানির পর সেও তাকদির সম্পর্কে বিভ্রান্ত আকিদা প্রচার করতে থাকে। হিশাম বিন আবদুল মালেক তাকে দামেশকে ডেকে আনেন এবং ইমাম আওজায়ির সঙ্গে আলোচনা করতে বসান। দীর্ঘ আলোচনা শেষে ইমাম আওজায়ি তাকে হত্যা করার ফতোয়া দেন। দামেশকেই তাকে হত্যা করা হয়। বিখ্যাত আলেম রজা বিন হাইওয়াহ তখন মন্তব্য করেছিলেন, 'এক হাজার রোমান সেনাকে হত্যা করার চেয়েও তাকে হত্যা করা বেশি উত্তম হয়েছে।' আলেমদের অনেকে এই ঘটনার পর খলিফাকে পত্র লিখে অভিনন্দন জানান এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে ধন্যবাদ জানান।[৪]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তার শিষ্য ইবনুল কাইয়িম জাওজিয়া রহ.-কে নসিহত করে বলেছিলেন, 'সংশয়ের ক্ষেত্রে সাবধান থাকবে। তোমার অন্তর যেন স্পঞ্জের মতো না হয়, যেখানে সংশয় প্রবেশ করলে তা চুষে ফেলবে। অন্তর হবে স্বচ্ছ কাঁচের মতো, যেখানে সংশয় এক পাশ দিয়ে এলে অন্য পাশে চলে যাবে।[৫]

---

১. *আল-বিদাউ ওয়ান নাহয়ু আনহা*, ৫৭

২. *আল-ইবানা আল-কুবরা*, ৪০৩

৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন—*আখলাকুল উলামা*, ৪৮; *তাবাকাতুল হানাবিলা*, ১/৩৪২; *আল-ইবানাতুস সুগরা*, ২৮২; *উসুলুস সুন্নাহ*, ২৯৩; *আর-রাসাইল ওয়াল মাসায়িলুল মারবিয়া আন আহমদ ফিল আকিদা*, ৯৬৫

৪. *লিসানুল মিজান*, ৪/৪২৪

৫. *মিফতাহু দারিস সাআদাহ*, ১/৩৯৫

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলতেন, ‘যে নিজ থেকে বিনা কারণে বেদআতিদের কথাবার্তা শ্রবণ করে, সে আল্লাহর জিম্মা থেকে বের হয়ে যায়।’

ইমাম জাহাবি রহ. বলেন, ‘এ সব কারণে সালাফরা খুবই সতর্ক থাকতেন। সহজে তারা বিভ্রান্তদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। কারণ, মানুষের অন্তর দুর্বল আর সংশয়গুলো আক্রমণ করে লুণ্ঠনকারীর মতো।!’[১]

সালাফরা সাধারণত অযথা বিতর্ক এড়ানোকে গুরুত্ব দিতেন। এ বিষয়ে তাদের বেশ কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এখানে কিছু উল্লেখ করা হল :

১। আহলুস সুন্নাহর পথ হল, অযথা বিতর্ক পরিহার করা।[২]
২। দ্বীন তর্কের নাম নয়, বরং দ্বীন হল আনুগত্যের নাম।[৩]
৩। তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অনেক সময় বিভ্রান্তির পথ সুগম হয়।[৪]
৪। নসিহতের মজলিসের মাধ্যমে ফায়দা পাওয়া যায়। বিতর্কের মজলিস তা বন্ধ করে দেয়।[৫]

একবার ভাবুন, যদি সালাফদেরই এমন অবস্থা হয়, তা হলে আমাদের কেমন সতর্ক থাকা উচিত! সালাফদের তুলনায় আমাদের ইলম-আমল সব কিছুই অনেক কম। এই জন্য একান্ত বাধ্য না হলে এ সব সংশয় থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এতে ঈমান নিরাপদ থাকবে। কিন্তু সব সময় দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়ে এ সব সম্পর্কে জানতে হয়। এ সবের জবাব দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে আবশ্যক হল, বিশুদ্ধ ইলম অর্জন করা এবং কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে কাজ করা। নিজের বুঝ অনুযায়ী কাজ করলে অনেক সময় এক ফেতনা দমন করতে গিয়ে নতুন আরও ফেতনা জন্ম নেয়! পাশাপাশি দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে আমাদের। আল্লাহ সবাইকে বিষয়টি বুঝে আমল করার তাওফিক দিন।

---

১. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৭/২৬১
২. *আখলাকুল উলামা*, ৫২
৩. *শারহুস সুন্নাহ*, ২৪
৪. *শারহুস সুন্নাহ বারবিহারি*, ২৪
৫. *আল-ইবানাতুল কুবরা*, ২/৫৪৮

হক গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা

হক গ্রহণের সুযোগ দেওয়া বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। বহু মানুষের সামনে হক স্পষ্ট হওয়ার পরেও তারা তা গ্রহণ করতে পারে না। তাদের চারপাশ ঘিরে রাখে নানা প্রভাবক শক্তি, যা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। এই প্রভাবক শক্তিগুলো সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেন আমাদের জীবনে এ সব শক্তি আমাদেরকে হক গ্রহণে বাধা দিতে না পারে।

আসাবিয়ত

আসাবিয়ত বা দলপ্রীতি প্রায়ই হক গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বহু মানুষ হক চিনতে পেরেও শুধু এই কারণে তা প্রত্যাখ্যান করে যে—তার পূর্বপুরুষ, নেতৃত্ব, বংশ, শিক্ষকগণ কিংবা প্রিয় মানুষরা তা গ্রহণ করেননি। কুরআনুল কারিম মানবচরিত্রের এই দিকটি এভাবে আলোচনা করেছে—

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

এইভাবে তোমার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই আমি কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন এর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী হিসাবে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।' সেই সতর্ককারী বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তারচেয়ে উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ নিয়ে আসি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?' তারা বলত, 'তোমরা যা-সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।'[১]

---

১. সুরা জুখরুফ, ২৩-২৪

আবু তালেবের ঘটনাতেও আসাবিয়তের কারণে হক প্রত্যাখ্যানের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু তালেবের মৃত্যুশয্যায় নবীজি সা. তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করেন। নবীজি সা. বলেন, 'চাচা, আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নিন, আমি আল্লাহর কাছে আপনার বিষয়ে সাক্ষ্য দেব।' আবু তালেবের পাশে তখন আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া উপস্থিত ছিল। তারা আবু তালেবকে বলল, 'হে আবু তালেব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছেড়ে দেবে?' নবীজি আবার আবু তালেবকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ করেন, অপর দিকে কাফেররা তাকে বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি জানিয়ে দেন, তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মেই থাকছেন। নবীজি সা. তখন বলেন, 'আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার বিষয়ে দোয়া করতেই থাকব।' এরপর আয়াত অবতীর্ণ হয়—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে—যদিও তারা আত্মীয় হয়; তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।[১]

ইসলামের শুরু থেকেই আবু তালেব ছিলেন নবীজির সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী; এমনকি নবীজিকে সাহায্য করার কারণে তিনি অবরোধের শিকারও হয়েছিলেন! অন্য অনেকের চেয়ে ইসলামের সত্যতা তার কাছে বেশি স্পষ্ট ছিল। তবু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আবু জেহেল যখন তাকে মনে করিয়ে দিল, তিনি কি তার পিতার ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছেন—তখনই তিনি নিজেকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। আসাবিয়তের কারণে হক ত্যাগ করে বেছে নেন জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির জীবনকে![২]

---

১. সুরা তাওবা, ১১৩

২. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সম্ভবত আমার শাফাআত কেয়ামতে তার উপকার করবে। ফলে তিনি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সামান্য আগুনের মধ্যে থাকবেন, তাতেই তার মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে।' (*বুখারি*, ১৪০৯ ও ২৪০০; *মুসলিম*, ১৯৫) অন্য হাদিসে নবীজি সা. বলেন, তিনি সামান্য গোড়ালি পরিমাণ আগুনের মধ্যে রয়েছেন। আমি না হলে তিনি আগুনের (জাহান্নামের) তলদেশে থাকতেন।' (*বুখারি*, ৩৬৭০)

মানুষের আসাবিয়ত শুধু পূর্বপুরুষের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় না, বরং নানাভাবে এটি প্রকাশ পায়। কুরআনুল কারিম এমন অনেকগুলো ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছে। মানুষ অনেক সময় নিজেদের নেতা ও অভিজাতদের কারণে হক গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (٦٨)

তারা আরও বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের নেতা ও প্রভাবশালীদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও আর তাদেরকে দাও মহা অভিসম্পাত।[১]

কেয়ামতের দিন এই অভিজাত নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে তাদের অনুসারীরাই অভিযোগ করবে। সে দিন তাদের মধ্যে যে আলাপ হবে, তা কুরআনুল কারিম বিবৃত করেছে এভাবে—

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ (٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣)

হায়, তুমি যদি জালেমদেরকে দেখতে, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে! তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন

---

১. সুরা আহজাব, ৬৭-৬৮

> হতাম।' যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল, তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।' যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে! আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে, যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরিক স্থাপন করি।' যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে। আর আমি কাফেরদের গলদেশে শিকল পরিয়ে দেব। তাদেরকে তারা যা করত, তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।[১]

আসাবিয়ত মানুষকে কতটা অন্ধ করে দেয়, তার প্রমাণ হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন ইমাম শাতেবি। আহমদ বিন তুলুনের শাসনকালে মিশরে এক খ্রিষ্টান ব্যক্তি বেশ পরিচিত ছিল সবার মধ্যে। তার জ্ঞান-বুদ্ধির উপর সবার আস্থা ছিল। একবার আহমদ বিন তুলুন তাকে নিজের রাজসভায় ডেকে আনেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'খ্রিষ্টধর্মের সত্যতা কী? সে নিজেই বা কেন এই ধর্ম অনুসরণ করছে?' সে বলল, 'এই ধর্মের সত্যতার বিষয়টি এবং আমার অনুসরণ—দুটিই পরস্পরবিরোধী বিষয়! একটির সঙ্গে আরেকটির মিল নেই। দুটির পরস্পরবিরোধী অবস্থান চিন্তা করলেও মাথা কাজ করে না। এই ধর্মের সত্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। আমাদের অনেক চিন্তাধারা ও আকিদাই ভুল থেকে মুক্ত নয়। একটু চিন্তা করলেই এই ভ্রান্তিগুলো ধরা পড়ে। তবু আমি এই ধর্ম অনুসরণ করি। কারণ, আমি দেখেছি, সব যুগের প্রভাবশালী শাসক, নেতা, উজির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই এই ধর্ম অনুসরণ করেছেন। যেহেতু তারা একে অনুসরণ করেছেন, তাই এর কোনো দলিল বা সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে, এই ভেবে আমি খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ করি।'[২]

ইমাম গাজালি বলেন, 'অনেক মানুষ এমন আছে, যাদের সামনে আকিদার কোনো বিষয় উপস্থাপন করা হলে তারা গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু পরে যখন বলা হয়, এটা ইমাম আশআরির আকিদা, যদি তারা ইমাম আশআরির ব্যাপারে নেতিবাচক হয়, তা হলে ঘৃণাভরে সেই আকিদা প্রত্যাখ্যান করে। শুধু

---

১. সুরা সাবা, ৩১-৩৩
২. *আল-ইতিসাম*, ১/১৫৯

সাধারণ মানুষের অভ্যাস এমন নয়, বরং অনেক আলেমরাও এমন কাজ করে বসে! হ্যাঁ, যাদেরকে আল্লাহ ইলমের রুসুখ দান করেছেন এবং হককে হক হিসেবে দেখার তাওফিক দিয়েছেন, তাদের কথা আলাদা।[১]

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকা ও বেদআতি ধারাকে যখনই তাদের আমল ও আকিদার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়, তখন তাদের সহজ একটি জবাব থাকে—'আমাদের বুজুর্গরা এমন করেছেন। এ সব যদি ভুল হত, তা হলে তারা করলেন কেন?' এভাবে আসাবিয়ত মানুষকে হক গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

সহচরদের প্রভাব

মানুষ তার বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা তীব্র প্রভাবিত হয়। চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, রুচি—সব দিকেই এই প্রভাব থাকে। আবু তালেবের ঘটনায় আমরা দেখি, তার কাফের বন্ধুরা তাকে প্রভাবিত করেছে। বহু মানুষের হক গ্রহণে অস্বীকৃতি কিংবা হক থেকে বিচ্যুতির মূলে আছে বন্ধুত্বের প্রভাব। এ জন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে লক্ষ করো, কাকে বন্ধু বানাচ্ছ?'[২]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'মানুষের জন্য মানুষের চেয়ে বড় বিপদ আর নেই! আবু তালেবের মৃত্যুর সময় তার জন্য তার বন্ধুদের চেয়ে বড় বিপদ কি কিছু ছিল? এই বন্ধুরাই তার ও একটি কথার মধ্যে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল! যে কথাটি বললেই সে অনন্ত সৌভাগ্য অর্জন করতে পারত।'[৩]

মানুষ তাদের বন্ধুদের কারণে কীভাবে হেদায়েত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, কুরআনুল কারিম সে সম্পর্কে বলছে—

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (٢٩)

---

১. *আল-মুস্তাসফা*, ১/১১৭

২. *আবু দাউদ*, ৪৮৩৩; *তিরমিজি*, ২৩৭৮; *মুসনাদে আহমদ*, ৮৩৯৮

৩. *মাদারিজুস সালিকিন*, ১/৪৫৫

জালেম ব্যক্তি সেই দিন নিজ দুই হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসুলের সঙ্গে সৎ পথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর।' শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক।[১]

ইবরাহিম আ. তার জাতিকে তাদের সহচরদের বিষয়ে সতর্ক করে বলেছিলেন—

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (٢٥)

ইবরাহিম বলল, 'তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ—পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কেয়ামতের দিন তোমরা একে-অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত দেবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'[২]

কুরআনে আল্লাহ সেই সফলকাম মুমিনের কথা বলেছেন, যে তার বন্ধুদের কুফর ও ইরতেদাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (٥٤) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧)

---

১. সুরা ফুরকান, ২৭-২৯
২. সুরা আনকাবুত, ২৫

তারা একে-অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ বলবে, আমার ছিল এক সঙ্গী। সে বলত, 'তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে—আমরা যখন মরে যাব আর পরিণত হব মাটি ও হাড়গোড়ে, তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?' অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে। আর তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। বলবে, 'আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে! আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো হাজিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।'[১]

অহংকার

মানুষ অনেক সময় অহংকারের কারণে হক গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

যারা নিজেদের নিকট কোনো দলিল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার। এরা এই ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[২]

যারা অহংকার করে, আল্লাহ তাদেরকে হক থেকে বিচ্যুত করে দেন। অহংকারীর হৃদয়ে হকের স্থান থাকে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট ঘোষণা—

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٦)

---

১. সুরা সাফফাত, ৫০-৫৭
২. সুরা গাফির, ৫৬

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায়, তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেব। তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও এতে বিশ্বাস করবে না। তারা সৎ পথ দেখলেও একে পথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। তা এই কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।[১]

অহংকারীদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হলেও তাদের ভাবান্তর হয় না। এরশাদ হয়েছে—

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٧)

যখন তার নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়—যেন সে তা শুনতে পায়নি, যেন তার কান দুটো বধির। অতএব তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।[২]

এ জন্যই নবীজি সা. বারবার অহংকারের বিষয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যার অন্তরে বিন্দু-পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এক ব্যক্তি বলল, 'যদি কেউ চায়, তার পোশাক সুন্দর হোক?' নবীজি সা. বললেন, 'আল্লাহ সুন্দর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হল, হক প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা।'[৩]

হিংসা

অন্তরের অন্যতম প্রধান একটি ব্যাধি হল হিংসা। হিংসা এবং অহংকার পাশাপাশি চলে। একটি থেকে জন্ম হয় আরেকটির। হিংসার মানে হল, অন্যের উন্নতি-সমৃদ্ধি সহ্য করতে না পারা। কাউকে আল্লাহ যদি বিশেষ কোনো নেয়ামত দেন, তা হলে তা দেখে নিজের অন্তরে জ্বলন অনুভব করা।

ইবলিস আদম আ.-কে সেজদা করতে রাজি হয়নি। তার মনে হিংসা ও অহংকার দুটিই ছিল। হিংসাই তাকে হক থেকে বিচ্যুত করে। ইহুদিরা ঈসা

---

১. সুরা আরাফ, ১৪৬

২. সুরা লোকমান, ৭

৩. *মুসলিম*, ৯১; *আবু দাউদ*, ৪০৯৪; *মুসনাদে আহমদ*, ৪০৫৮

আ.-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল জেনে-বুঝে। হিংসার কারণেই তারা তাকে নবী হিসেবে মেনে নেয়নি। মক্কার কাফেররা নবীজিকে মেনে নেয়নি; আরবের ইহুদিদের বড় অংশ নবীজির নবুওতের সত্যতা জেনেও ইসলাম গ্রহণ করেনি—এর কারণ হিংসা। তাদের এই মানসিক অবস্থা কুরআনুল কারিম এভাবে বিবৃত করেছে—

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦)

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সেরূপ জানে, যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে এবং তাদের এক দল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে।[১]

ইহুদিদের হিংসার একটি বাস্তব নমুনা পাওয়া যায় সালামা বিন সালামা বিন ওয়াকশ রাজি.-এর ঘটনায়। তিনি ছিলেন বদরি সাহাবি। তিনি বলেন, 'আমাদের ঘরের পাশে একজন ইহুদি বসবাস করত। সে ছিল বনু আশহাল গোত্রের। নবীজির আগমনের পূর্বে একবার সে আমাদের আড্ডায় বসে নানা বিষয়ে কথা বলতে থাকে। সে বলতে থাকে, 'এই মূর্তিপূজারি লোকেরা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে না, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করে না।' এই নিয়ে উপস্থিতদের সঙ্গে তার তর্ক হয়। এক সময় সবাই তাকে জিজ্ঞেস করে, 'মৃত্যুর পরের জীবনের দলিল কী?' তখন সে বলে, 'ওই এলাকা থেকে একজন নবী আসবেন'—এই বলে সে মক্কার দিকে ইশারা করে। উপস্থিতদের মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে কম বয়সী। সে আমার দিকে ইশারা করে বলে, 'এই ছেলে যদি বেঁচে থাকে, তা হলে তার জীবদ্দশাতেই সেই নবী আগমন করবেন।' এর কিছু দিন পর নবীজি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। আমরা ঈমান আনলাম, কিন্তু সেই ইহুদি ব্যক্তি কুফরি করল! আমরা সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমাদেরকে এই বিষয়ে বলনি?' সে বলল, 'বলেছি, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে (নবীজি) বলিনি।''[২]

---

১. সুরা বাকারা, ১৪৬

২. *মুসনাদে আহমদ*, ১৫৮৭৯; *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৪৭১

যশ-খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভ

অনেকে হক গ্রহণে দ্বিধান্বিত থাকে। কারণ, এটি গ্রহণ করলে তার সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান কমে যেতে পারে। লোকে তাকে আগের মতো গুরুত্ব নাও দিতে পারে। প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন, তাদের অন্যতম হলেন রোমান সম্রাট হিরাকল। নবীজির ইসলাম প্রচারের সংবাদ জেনে তিনি সিরিয়ায় অবস্থানরত কুরাইশদের একটি ব্যবসায়িক দলকে ডেকে পাঠান। এই কাফেলায় আবু সুফিয়ানও ছিলেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। হিরাকল আবু সুফিয়ানকে নানা বিষয় জিজ্ঞেস করেন, নবীজি সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান। আবু সুফিয়ান বলেন, 'আল্লাহর কসম, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে। এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।' যা-ই হোক, আবু সুফিয়ান প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন। প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষে হিরাকল প্রতিটি বিষয় পর্যালোচনা করে বলেন, 'তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এ দু পায়ের নিচের জায়গার মালিক হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্যে থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি! যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোনো কষ্ট স্বীকার করতাম! আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে অবশ্যই তাঁর দু-খানা পা ধুয়ে দিতাম!'

হিরাকলের বন্ধু সিরিয়ার পাদরি ইবনে নাজুর বলেন, 'হিরাকল তার হিমসের প্রাসাদে রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দরজা বন্ধ করা হল। তারপর তিনি সামনে এসে বললেন, 'হে রোমবাসী, তোমরা কি কল্যাণ, হেদায়েত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তা হলে এই নবীর বায়আত গ্রহণ করো।' এ কথা শুনে তারা জংলি গাধার মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ অবস্থায় পেল। হিরাকল যখন তাদের অনীহা লক্ষ করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, 'ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনো।' তিনি বললেন, 'আমি একটু আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা

করেছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।' এ কথা শুনে তারা তাকে সেজদা করল এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হল। এই ছিল হিরাকলের শেষ অবস্থা।'[১]

মূলত হিরাকল ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে, ইসলাম গ্রহণ করলে জনসাধারণ তার বিপক্ষে চলে যাবে, এমনকি তার ক্ষমতাও চলে যেতে পারে—তখন সে ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করেও ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

মানুষ নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি টেকাতে গিয়ে কীভাবে হেদায়েত থেকে দূরে থাকে, তার সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন ইবনুল কাইয়িম রহ.। তিনি লিখেছেন, 'একবার তার সঙ্গে একজন পাদরির খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ে বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে পাদরির সামনে হক স্পষ্ট হয় এবং সে নিরুত্তর হয়ে যায়। ইবনুল কাইয়িম তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'এখন তোমাকে হক গ্রহণে কীসে বাধা দিচ্ছে?' সে বলল, 'আমি যখন এই গাধাদের (খ্রিষ্টান) কাছে আসি, তখন তারা আমার বাহনের পায়ের নিচেও দামি কার্পেট বসিয়ে দেয়। তাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাকে দেয়। আমার কোনো আদেশ তারা অমান্য করে না। আমি কোনো কাজ-কর্ম জানি না। কুরআনুল কারিম পড়তে পারি না। ফিকহ বা অন্য কোনো শাস্ত্র জানি না। আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তা হলে কীভাবে চলব! আমাকে তো বাজারে ভিক্ষা করে জীবিকা অর্জন করতে হবে।' ইবনুল কাইয়িম বললেন, 'এমনটা হবে না। তুমি কীভাবে ভাবলে যে, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ বেছে নেবে আর তিনি তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন? আর যদি দুনিয়াতে কিছু দুঃখ-কষ্ট তোমাকে গ্রাস করে নেয়ও, তাতেও সমস্যা নেই, আখেরাতে তো জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেলে!' সেই ব্যক্তি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি, কিন্তু ইসলামও গ্রহণ করেনি, বরং সে আলোচনা সমাপ্ত করে চলে যায়।'[২] সম্পদ ও পদের লোভের কারণে জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামের রাস্তা গ্রহণ করেই সে সন্তুষ্ট থাকে। এ জন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি করে, কারও সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করে তার ধর্মের।'[৩]

---

১. *বুখারি*, ৭; *মুসলিম*, ১৭৭৩; *মুসনাদে আহমদ*, ২৩৭০
২. *হিদায়াতুল হায়ারি*, ১১৯
৩. *তিরমিজি*, ২৩৭৬; *মুসনাদে আহমদ*, ১৫৮২২

ইবনুল কাইয়িমের মতে, মানুষ হক গ্রহণ থেকে প্রথমে বিরত থাকে অজ্ঞতার কারণে। কোনো বিষয় স্পষ্ট না হলে তা গ্রহণ করাও সহজ হয় না। যদি এর সঙ্গে যোগ হয় নিজের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি, ত্যাগের আশঙ্কা—তা হলে হক থেকে সে আরও দূরে সরে যায়! প্রভাব-প্রতিপত্তি-খ্যাতি হারানোর ভয় যুক্ত হলে সে আরও দূরে সরে যায়! যখন বুঝতে পারে, হক গ্রহণ করলে তার বন্ধুবান্ধব, সমাজ তার জীবন-জীবিকায় বাধা দিতে পারে—তখন হক গ্রহণ করা তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এই জন্যই হিরাকল ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি।[১]

দেওবন্দি ঘরানার প্রভাবশালী আলেম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি একবার শিয়ালকোট সফরে ছিলেন। রেলস্টেশনে উনার সঙ্গে এক ইংরেজ পাদরির দেখা হয়। পাদরি তার সঙ্গে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করে। আল্লামা কাশ্মিরি নবীজির নবুওতের পক্ষে কুরআন, তাওরাত, ইনজিল ও যুক্তির মাধ্যমে ৪০টি দলিল উপস্থাপন করেন। পাদরি পুরো আলোচনা শুনে বলল, 'যদি আমার বেতনের লোভ না থাকত, তা হলে আপনার এই আলোচনা শুনেই আমি মুসলমান হয়ে যেতাম! কারণ, আপনার কথা থেকে আমি আমার নিজের ধর্ম সম্পর্কেও অনেক কিছু জেনেছি।' আল্লামা কাশ্মিরি বলেন, 'সত্য জেনেও ঈমান আনলেন না! এ থেকে বোঝা গেল, আপনার মধ্যে হক গ্রহণের মানসিকতা নেই, শুধু টাকার লোভ আছে।' পরে সেই ব্যক্তি চলে যায়।[২]

---

১. *হিদায়াতুল হায়ারি* থেকে সংক্ষেপিত; দেখুন—*হিদায়াতুল হায়ারি*, ১৬

২. *আনওয়ারে আনওয়ারি*, ৩৭

সংশয়ী ও বিভ্রান্তদের প্রকারভেদ

যারা নিত্যনতুন সংশয় ও বিভ্রান্ত চিন্তাধারা নিয়ে সামনে আসে, তাদের সবার অবস্থান এক স্তরের নয়। আকিদা ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে রয়েছে নানা মতবিরোধ। তবে মোটা দাগে তারা দুটি ভাগে বিভক্ত।

১. ইসলামি শরিয়া-অস্বীকারকারী

এই দলটি সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা ইসলাম ও শরিয়াকে অস্বীকারের কথা বলে। আল্লাহকে রব হিসেবে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে তারা মেনে নেয় না। এই বিষয়টি নিয়ে তাদের কোনো লুকোছাপা নেই। প্রকাশ্যেই তারা নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী (ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু) নাস্তিক, সংশয়বাদী ব্যক্তিরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণির লোক নিয়মিত ইসলামের নানা বিষয় নিয়ে আপত্তি তোলে, সমালোচনা করে। এ ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনায় জড়ানো উচিত নয়। বিশেষ করে তারা যখন শরিয়ার শাখাগত কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ তোলে, তখন তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, এ সব আলোচনার কোনো ফলাফল নেই। যে ব্যক্তি শরিয়াকেই মানে না, তার সঙ্গে পর্দার বিধান নিয়ে আলাপ অনর্থক।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রথম অনুষঙ্গ ছিল বিশুদ্ধ তাওহিদ। নবীজি সা. যখন মুয়াজ রাজি.-কে ইয়েমেন পাঠান, তখন তাকে বলেছিলেন, 'তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এ কথার আহ্বান জানাবে যে—আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। যদি তারা তা মেনে নেয়, তা হলে তাদের জানিয়ে দেবে—দিনে ও রাতে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরজ করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তা হলে তাদের জানিয়ে দেবে যে—আল্লাহ তাদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা

হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তারা এ কথাটি মেনে নিলে, সাবধান, জাকাত হিসাবে তুমি তাদের থেকে বাছাই করে উত্তমগুলো নেবে না। আর মজলুমের (বদ) দোয়া থেকে সাবধান! কেননা, আল্লাহর ও মজলুমের দোয়ার মধ্যে কোনো অন্তরায় নেই।'[১]

এই হাদিসে দেখা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ ও জাকাতের আহ্বানের পূর্বে তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার কথা বলেছেন। যদি তাওহিদের বিষয়ে একমত না হয়েই শাখাগত বিতর্কে জড়িয়ে পড়া হয়, তা হলে তাতে শুধু সময়ই নষ্ট হবে, অন্য কোনো উপকার হবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে দু পক্ষের মধ্যে স্থিরীকৃত কোনো সীমানা নেই, যেখানে তারা পৌঁছুতে পারে। ফলে এই আলোচনাগুলো ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে, মীমাংসার কাছাকাছি এসেও মীমাংসা হয়ে ওঠে না। এই জন্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে শাখাগত বিষয়ে আলোচনার পরিবর্তে বিশুদ্ধ তাওহিদ নিয়ে আলোচনা করা বেশি প্রয়োজন। উসুলে একমত হতে পারলে বাকি বিষয়গুলোর মীমাংসা সহজ। এক আরব বেদুইন বড় চমৎকার বলেছিলেন—

'إذا ثبتت الأصول في القلوب، نطقت الألسن بالفروع'

যখন উসুল অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, জবান শাখাগত বিষয়ে বলতে থাকে।[২]

২. ইসলামি শরিয়া-স্বীকারকারী

এই দলে দুই ধরনের লোকজনকে দেখা যায়। এদের মধ্যে প্রথম দল প্রতারক। তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামি শরিয়াকে অস্বীকার করে না, বরং মেনে নেওয়ার ভান করে। কিন্তু মনে-প্রাণে তারা ইসলামি শরিয়ার ঘোর বিরোধী। পূর্বে উল্লেখিত দলের সঙ্গে তাদের তফাত হল, সাহস কম হওয়ায় তারা সরাসরি শরিয়াকে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না অথবা কৌশলগত কারণে শরিয়া মেনে নেওয়ার ভান করছে। এরা সাধারণত শরিয়ার বিভিন্ন বিধানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কখনও বলে—এই বিধান শুধু আরব-সমাজের জন্য প্রযোজ্য ছিল, এখন আর প্রযোজ্য নয়। কখনও বলে—সংস্কৃতির সঙ্গে ফিকহকে মেলানো যাবে না। দুইটা আলাদা রাখতে হবে।

---

১. *মুসলিম*, ১৯
২. *জামিউ বায়ানিল ইলম*, বর্ণনা নং ১৪৭৩

কখনও বলে—ইসলামে হুদুদ-কিসাসের কোনো বিধানই নেই, মুরতাদের শাস্তি নেই। এই গ্রুপের অনেকে মুসলিম-সমাজে বেশ গ্রহণযোগ্যতাও লাভ করেন। বিশেষ করে যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন কিংবা বড় ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাদের প্রতি জনসাধারণের বিশেষ মুগ্ধতা থাকে। এই মুগ্ধতা কাজে লাগিয়ে তারা ছড়াতে থাকে নানা ভ্রান্ত চিন্তাধারা।

সাধারণ মানুষ এই লোকদের বাহ্যিক বেশভুষা ও কথাবার্তায় তাদেরকে একনিষ্ঠ মুসলিম মনে করে। জনগণের চোখে তারা কেউ শায়খ, কেউ স্কলার, কেউ অনেক বড় গবেষক। কিন্তু বাস্তবতা হয়তো শত ভাগ বিপরীত। এই দলটি সব সময় ইসলামের নানা বিধিবিধান নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। গবেষণার নামে উদ্ভট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। মোটকথা, এরা আল্লাহকে একমাত্র বিধানদাতা হিসাবে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে না। তাদের মনে আসন করে দুনিয়াবি অনেক তন্ত্রমন্ত্র ও মতবাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা।

দ্বিতীয় আরেকটি দল আছে, যারা মনে-প্রাণে ইসলামি শরিয়া মেনে নিয়েছে। আল্লাহকে তারা রব হিসাবে মানে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দ্বীনের ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। শরিয়াকে তারা ঘৃণাও করে না। কিন্তু ইলমশূন্যতা বা অন্যান্য কারণে তাদের মনে কিছু সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সবের জবাব তাদের জানা নেই। তারা অন্তর থেকেই হক তালাশ করে এবং এ সব প্রশ্নের জবাব জানতে চায়। এই শ্রেণির মানুষের উপর ব্যাপকভাবে মেহনত করা উচিত। তাদের হাত ধরে আন্তরিকতা ও দরদ নিয়ে বিষয়গুলো বোঝানো উচিত, যেন মন থেকে সকল সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায়।

সংশয় মোকাবেলায় ক্রিটিকাল থিংকিং

যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ফেতনা ও সংশয় মোকাবেলায় প্রথমে বিষয়টিকে এর সূক্ষ্মতা ও ব্যাখ্যাসহ বোঝা জরুরি। বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে এর প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় কিংবা খণ্ডন করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রতিটি বিষয়কে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নানাভাবে মানবজাতিকে চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

বলো, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখো, তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারীমাত্র।'[১]

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দেখা যায়, মুশরিকদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও দাবির জবাব এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের চিন্তার ভিত্তিমূলে আঘাত করে। মুশরিকদের একটি বড় প্রশ্ন ছিল ঈসা আ.-কে নিয়ে। পিতা ছাড়া কীভাবে সন্তানের জন্ম হতে পারে, তা ছিল তাদের বোধগম্যতার বাইরে। তাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

---

১. সুরা সাবা, ৪৬

> আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর একে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।[১]

এই আয়াতে আদম আ.-এর দৃষ্টান্ত টেনে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, পিতা-মাতা ছাড়াই আদম আ.-কে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য পিতা ব্যতীত ঈসা আ.-কে সৃষ্টি করাও সহজ।

এক হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন এক গর্তে দু-বার দংশিত হয় না।'[২] এই হাদিস থেকে স্পষ্ট যে, মুমিন সর্বক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে, প্রতিটি বিষয় নিয়ে সে চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণ শেষে তবেই বিষয়টি সে গ্রহণ বা বর্জন করবে। চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের এই ধারাকেই আজকাল 'ক্রিটিক্যাল থিংকিং' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এই বিষয়ে রচনা করা হচ্ছে নিত্যনতুন বইপত্র।

সালাফে সালেহিনের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি, তারা ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাদের জীবনের নানা ঘটনা, লেখালেখি, বক্তব্য—এগুলোতে এর শত শত প্রমাণ বিদ্যমান। তাদের সময়ে নানা বুদ্ধিবৃত্তিক ফেতনা সামনে এসেছিল। মুতাজিলা, ইখওয়ানুস সাফা, গ্রিক দর্শন, বাতেনিদের সাহিত্য ইত্যাদি নানা ফেতনা তারা সমূলে উৎখাত করেছেন নিজেদের চিন্তা ও ইলমের সমন্বয় করে। তারা প্রতিটি মতবাদের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন, বাহ্যিক আবরণের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা কুৎসিত রূপটি তুলে ধরেছেন সবার সামনে। ইমাম গাজালি, ইজ্জুদ্দিন বিন আবদুস সালাম, ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের লেখায় এর তীব্র ঝলক বিদ্যমান।

বর্তমান সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ফেতনাগুলো মোকাবেলার ক্ষেত্রে আমাদেরকেও ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ের সাহায্য নিতে হবে। যে কোনো মতবাদ খণ্ডনের ক্ষেত্রে যদি আমরা গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণী শক্তি প্রয়োগ করি, তা হলে খণ্ডনের কাজটি আমাদের জন্য সহজ হবে। শায়খ আহমদ ইউসুফ আস-সাইয়েদ কোনো মতবাদ বা চিন্তাধারা খণ্ডনের কিছু নীতিমালা উল্লেখ করেছেন। এক নজরে সেগুলো দেখা যাক :

---

১. সুরা আলে ইমরান, ৫৯

২. *বুখারি*, ৬১৩৩; *মুসলিম*, ২৯৯৮

১. দলিলবিহীন কথা গ্রহণ করা যাবে না

সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম, মিডিয়া বা বইপত্রে নিয়মিত যে সব চিন্তাধারা ও মতবাদ প্রচার করা হয়, লক্ষ করলে দেখা যাবে, এর বেশির ভাগই দলিলশূন্য ফাঁকা বুলিমাত্র! অনেক সময় চাকচিক্যময় কথার আড়ালে তারা নিজেদের এই দুর্বলতা লুকাতে চায়। এ জন্য কথার উপস্থাপন বা মারপ্যাঁচে প্রভাবিত না হয়ে দেখতে হবে, কথার পিছনে দলিল আছে কি না! কারণ, যে কোনো চিন্তাধারা খণ্ডনের পূর্বে এর পক্ষের দলিলগুলো জানা প্রয়োজন। যদি দলিল থাকে, তা হলে সেই দলিলের পর্যালোচনা হবে। প্রয়োজন হলে খণ্ডন করা হবে। যদি দলিল না থাকে, তা হলে তো খণ্ডনের কিছু নেই। তাদের দাবির উল্টোটা বলে দিলেই হবে।

যেমন, যারা জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করে, তারা বলে থাকে—মানবজীবনে নক্ষত্রমণ্ডলের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের জীবন যাপন ও অভ্যাসকে সেই নক্ষত্রমণ্ডল প্রভাবিত করে, যার অধীনে তার জন্ম হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই দাবির পিছনে কোনো দলিল নেই। এটি নিছক একটি মনগড়া দাবিমাত্র! যেহেতু এর কোনো দলিল নেই, ফলে দলিল খণ্ডনেরও কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে আপনি শুধু এর উল্টোটা বলে দিন! আপনি বলবেন—মানুষের জীবনে নক্ষত্রমণ্ডলের কোনো ভূমিকা নেই! এগুলো জানারও কোনো দরকার নেই!

দলিলবিহীন কথা কোনো গুরুত্ব রাখে না। অন্তত কোনো-না-কোনো দলিল তো দিতেই হবে। চাই সেটা শরয়ি বা অভিজ্ঞতালব্ধ কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো দলিল হোক। যদি কোনো দলিলই দেওয়া না হয়, তা হলে এর পিছনে সময় নষ্ট করা দরকার নেই। সরাসরি এর বিপরীতটা বলে দিলেই আলোচনা শেষ। যদি সে বিপরীত কথার দলিল জানতে চায়, তা হলে তাকে বলা হবে—আগে তোমার কথার দলিল দাও, এরপর আমারটা দিচ্ছি!

যেমন, অনেকে বলে থাকে—ইসলাম একটি নিষ্ঠুর ধর্ম। অনেক সময় তারা এর দলিল হিসাবে মুসলমানদের জিহাদের ঘটনা নিয়ে আসে। এ সব ক্ষেত্রে তাদের সামনে জিহাদ-সংক্রান্ত আলোচনা স্পষ্ট করা যায়। কিন্তু যদি তারা কোনো দলিল ছাড়াই কথাটি বলে থাকে, সে ক্ষেত্রে জিহাদ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বরং তার কথাটি উল্টিয়ে দিলেই হচ্ছে। তাকে বলা হবে—ইসলাম নিষ্ঠুর ধর্ম নয়।

কোনো মতবাদ বা চিন্তাধারা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হল, তার অবস্থানের পিছনে দলিল আছে কি না, তা যাচাই করা। কেউ কোনো নতুন চিন্তা উপস্থাপন করলে প্রথমেই তাকে বলতে হবে—তোমার কথার দলিল কী? দলিল বলো, তা হলে পর্যালোচনা করতে সুবিধা হবে।

২. চিন্তার বিশ্লেষণ : দলিল, ইস্তেদলাল ও নতিজা

প্রথম নিয়মে বলা হয়েছে, যদি কেউ দলিল উপস্থাপন করতে না পারে, তা হলে তার সঙ্গে আলাপ দীর্ঘায়িত না করে উল্টো কথাটি বলে দেওয়া। কিন্তু যদি দলিল উপস্থাপন করে, তা হলে চিন্তার অনেকগুলো ধাপ পার হতে হবে; চিন্তা ও দর্শনটিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তার চিন্তাটিকে বিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে, তিনটি জিনিসকে বিশ্লেষণ করা :

ক) দলিল: কেউ দলিল উপস্থাপন করলে প্রথমে সেই দলিলটি নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। যেমন: দলিলটি মৌলিকভাবে সহিহ কি না? দলিলটি সঠিকভাবে বোঝা হয়েছে কি না? দলিলটির কি শুধু একটিই অর্থ আছে, না একাধিক অর্থেরও সম্ভাবনা আছে? দলিল যিনি উপস্থাপন করেছেন, তিনি নিজে এই প্রকার বা শ্রেণির বিষয়কে দলিল হিসাবে মানেন কি না? দলিলের এমন কোনো অংশ আছে কি না, যা অপর পক্ষ গোপন করেছে?

খ) ইস্তেদলাল: দলিল থেকে ফলাফলে পৌঁছার যে প্রক্রিয়া, একে বলা হয় ইস্তেদলাল। দলিল বিশ্লেষণ শেষে ইস্তেদলালকে পর্যালোচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে—দলিল থেকে সে যে ফলাফল বের করছে, তা কী নিজের ইচ্ছামতো আরোপিত, নাকি এটি দলিলের সঙ্গেই সম্পৃক্ত! দলিল থেকে কি শুধু এই একটি ফলাফলেরই অবকাশ আছে, নাকি আরও দুয়েকটি সঠিক ফলাফল বের করারও সুযোগ আছে ইত্যাদি!

গ) নতিজা: নতিজা মানে হল ফলাফল। দলিল উপস্থাপন করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটিই নতিজা। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, যে নতিজা বা ফলাফল বের করা হয়েছে, এর চেয়ে শক্তিশালী বিপরীতমুখী কোনো ফলাফল পাওয়া যায় কিনা!

অর্থাৎ বুঝতে পারলাম, কেউ দলিলের মাধ্যমে কোনো চিন্তা উপস্থাপন করলে সে ক্ষেত্রে তিন ধাপে ক্রিটিক করতে হবে: প্রথমত, দলিলের বিশ্লেষণ হবে। দ্বিতীয়ত, ইস্তেদলালের বিশ্লেষণ হবে। তৃতীয়ত, নতিজার বিশ্লেষণ হবে।

৩. দলিলের বিশ্লেষণ

দলিল বিশ্লেষণের মূল কথা হল, সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে দলিলটিকে যাচাই করতে হবে। এই যাচাইয়ের কয়েকটি নমুনা দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

ক) ২০১৩ সালে শাতেমে রাসুলদের বিচারের দাবিতে ফুঁসে ওঠে বাংলাদেশের তাওহিদি জনতা। হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে শুরু হয় আন্দোলন। ৬ এপ্রিল ঢাকার পল্টনে অনুষ্ঠিত হয় বৃহৎ জনসমাবেশ। সে দিনই বিবিসি সংলাপ প্রচারিত হয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন পক্ষের একাধিক আলোচক উপস্থিত ছিলেন। সেই সংলাপে ব্লগার আইরিন সুলতানা বলেন, 'ধর্ম আমাদের কী শিক্ষা দেয়? আমরা খুব কম বয়স থেকে যে শিক্ষা, যে ইতিহাসটি জেনে এসেছি—প্রিয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতেন এক বুড়ি, তিনি এক দিন তা বিছিয়ে দেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গিয়ে খোঁজ করেছিলেন, তিনি অসুস্থ কি না! তিনি তাঁর শত্রু ছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সেবা করেছিলেন। সেই শিক্ষা কি আমরা কোথাও রাখছি?'

আইরিন খানের বক্তব্যমতে, শাতেমদের শাস্তি দেওয়া নবীর শিক্ষা নয় কিংবা ইসলামের নির্দেশও নয়। হেফাজতে ইসলাম অযথাই বিচারের দাবি করে বাড়াবাড়ি করেছে। এখানে আইরিন খানের দলিল হল বুড়ির ঘটনা। যেহেতু কোনো চিন্তা-পর্যালোচনার প্রথম কাজ দলিল পর্যালোচনা, তাই আমাদেরকে দেখতে হবে—তার দলিলটির মান কেমন? এটি বিশুদ্ধ কি না? বাস্তবতা হল, বুড়ির এই ঘটনা শত ভাগ বানোয়াট একটি ঘটনা, যা প্রচলিত বইপত্রে উল্লেখ করা হয়। হাদিস, সিরাত বা ইতিহাসের বইয়ে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। অর্থাৎ আইরিন খান নিজের দাবির পক্ষে যে দলিল উপস্থাপন করেছেন, তা বিশুদ্ধ নয়। ফলে তার দাবিটিও গ্রহণযোগ্যতা হারাল।

আইরিন খানের এই বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে, তার উপস্থাপিত দলিলটি সত্তাগতভাবে বিশুদ্ধ নয়।

খ) এক শ্রেণির মডার্নিস্টরা সাহাবিদের মদ্যপ বলে অভিহিত করে। দলিল হিসাবে তারা নাবিজ পানের বর্ণনাগুলো সামনে আনে এবং নাবিজ ও মদকে একই জিনিস বলে বসে। কিন্তু নাবিজকে মদ বলা বড় মাপের ভুল।

বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে মানজুর লিখেছেন, 'নাবিজের বেশ কয়েকটি অর্থ আছে। কিশমিশ, খেজুর, মধু, গম, যব ইত্যাদি সবগুলো থেকে তৈরি পানীয়কেই নাবিজ বলে।'[১] এখন নাবিজের অর্থ শুধুমাত্র মদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিলে বর্ণনাগুলোর অর্থ বুঝতে বড় ধরনের বিভ্রান্তির সূচনা হবে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মডার্নিস্টরা দলিল বিশুদ্ধ দিলেও তা বোঝার ক্ষেত্রে তাদের ভুল রয়েছে। ফলে এই ধরনের দলিলও বাতিল বলে গণ্য, যা দিয়ে ইস্তেদলাল করা যাবে না।

গ) এ ধরনের আরেকটি নমুনা, যা আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত, তা হল, সুরা কাফিরুনের একটি আয়াতকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার কর—

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।[২]

এই আয়াতটি কট্টর সেক্যুলাররাও নিয়মিত বলে থাকে। তাদের দাবি হল, এই আয়াতে সকল ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরাও যে সঠিক পথে আছে, তা প্রমাণ হয় এই আয়াত থেকে। তাদের মতে, তোমাদের দ্বীন তোমাদের—এই অংশের অর্থ হল, তোমরা সঠিক পথেই অবস্থান করছ। এ ক্ষেত্রে দলিলটি তো মৌলিকভাবে বিশুদ্ধ, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যাটি ভুল। এই আয়াত থেকে এমন অর্থ নেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। সুরার শুরুতেই আল্লাহ বিধর্মীদেরকে সম্বোধন করেছেন কাফের বলে, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের ধর্ম বাতিল। সুরার নামকরণও করা হয়েছে 'কাফিরুন' নামে। এরপরে আর কথা থাকে না। দলিল বোঝার ভুল এখানে স্পষ্ট।

ঘ) অনেকে নিজের চিন্তার পক্ষে এমন দলিল দেয়, যা কিনা সে নিজেই হয়তো অস্বীকার করে! তাদের এ সব দলিল দেখে চিন্তা করতে হবে, তারা নিজেরা এই প্রকারের বিষয়কে দলিল হিসাবে মানে কি না? যদি সে সামগ্রিকভাবে এই বিষয়কে দলিল না মানে, তা হলে তার এই দলিলটিও তার যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। সুতরাং তাকে আটকানোর সহজ পথ হল, তাকে বলতে হবে—তুমি নিজেই তো এই বিষয়কে দলিল মানো না, তা হলে এখান থেকে দলিল দিচ্ছ কেন?

---

১. *লিসানুল আরব*, ৩/৫১১

২. সুরা কাফিরুন, ৬

কুরআনিস্টরা প্রায়ই হাদিস অস্বীকারের পক্ষে কিছু হাদিসকে উপস্থাপন করে। বিশেষ করে নবীজি সা. হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন মর্মে বর্ণিত হাদিসগুলো তাদের খুব প্রিয়। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে বলতে হবে—তুমি তো নিজেই হাদিস মানো না, তা হলে হাদিস থেকে হাদিস না লেখার প্রমাণ দিচ্ছ কেন? হাদিস যদি অগ্রহণযোগ্য হয়, তা হলে এই বর্ণনাগুলোও তো অগ্রহণযোগ্য। যে বিষয়কে তুমি নিজে অস্বীকার কর, সেই বিষয়কে কেন আরেকটি বিষয় অস্বীকারের দলিল বানাচ্ছ?

ঙ) অনেক সময় বিভিন্ন চিন্তার প্রচারকরা একটি দলিলের একাংশকে সামনে আনে, অপর অংশকে আড়ালে রাখে। অনেক সময় তারা কাজটি করে ইচ্ছাকৃতভাবে, যেন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আবার অনেক সময় কাজটি করে নিজেদের অজ্ঞতা ও জাহালতের কারণে। এ জন্য দলিল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, দলিলের সকল দিক সামনে এসেছে কি না! যেমন, নাস্তিকদের একাংশ বলে বেড়ায়—দুনিয়াতে নানা অকল্যাণকর বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই।

এখানে তাদের উপস্থাপিত দলিলে দুটি ভুল। প্রথমত, দুনিয়াবি বিষয়কে দ্বীনি সিদ্ধান্তের দলিল বানানো হয়েছে। অথচ দুটি ভিন্ন বিষয়। দুনিয়া মানুষের পরীক্ষা ও বিপদের স্থান। এ সব বিপদ-আপদ ও অকল্যাণের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত নয়। দ্বিতীয়ত, এখানে দলিলের একাংশকে গোপন করা হয়েছে। পৃথিবীতে শুধু অকল্যাণই নেই, অনেক কল্যাণও আছে। মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, মায়া-মমতা, দরদ, সুখ-শান্তি আছে। কিন্তু নাস্তিকরা সেই কথাটি চেপে গেছে। যদি অকল্যাণ মানেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বহীনতার দলিল হয়, তা হলে কল্যাণগুলো কীসের দলিল!

অনেক নাস্তিক বলে বেড়ায়—আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না। কারণ, তার কাছে অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু কবুল হয়নি। তাকে অনেক ডেকেও সাড়া পাইনি। এখানেও দেখা যাচ্ছে, দলিলের একাংশ গোপন করা হয়েছে। নাস্তিক ব্যক্তির দোয়া কবুল না হলেও পৃথিবীতে বহু মানুষের দোয়া কবুল হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা কী? দোয়া কবুল না হওয়া যদি আল্লাহ না থাকার প্রমাণ হয়, তা হলে দোয়া কবুল হওয়া তো আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ![১]

---

১. দোয়া কবুলের বিষয়টি অনেকগুলো বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দোয়া কবুলের কিছু শর্ত আছে, সেগুলো পূরণ করতে হয়। কিছু দোয়া আছে, যা আল্লাহ বান্দার জন্য উপযুক্ত সময়ে কবুল করেন। অনেক সময় বান্দা

বেশির ভাগ সময় দলিলের একাংশ গোপন করে মানুষ নিজের চিন্তা প্রচার করতে চায়। কারণ, দলিলের অপর অংশ সামনে এলে হয়তো তার নতিজার কোনো ভিত্তিই থাকবে না!

৪. ইস্তেদলালের বিশ্লেষণ

দলিলের পর ইস্তেদলালকে পর্যালোচনা করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, দলিলটি হয়তো বিশুদ্ধ, কিন্তু তার ইস্তেদলাল ভুল। দলিল থেকে যেভাবে ইস্তেদলাল করা হয়েছে, তা দলিলের সঙ্গে আবশ্যিক বা সম্পৃক্ত নয়। যেমন, নাস্তিকরা বলে—আল্লাহ বলে কেউ নেই। কারণ, তাকে আমরা দেখি না। এখানে তাদের দলিল হচ্ছে অদৃশ্য থাকা। সত্তাগতভাবে তাদের দলিলটি সঠিক। আল্লাহ তায়ালা দৃশ্যমান নন। দুনিয়ায় কেউ তাকে দেখার সামর্থ্য রাখে না। এবার দেখুন, তারা দলিলটি কীভাবে ইস্তেদলাল করেছে। অদৃশ্য থাকাকেই তারা ধরে নিয়েছে অস্তিত্বহীনতা হিসাবে। অথচ কোনো কিছু অদৃশ্য থাকলেই তার অস্তিত্বহীন হওয়া আবশ্যক নয়। এটি তাদের আরোপিত বিষয়। যেমন: নিউট্রন কিংবা সূক্ষ্ম এক-কোষী জীবাণুও বাহ্যিকভাবে আমাদের সামনে অদৃশ্য। খালি চোখে এগুলো দেখা যায় না। তা হলে এগুলোর কি কোনো অস্তিত্ব নেই? কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা এক জিনিস আর সেটি খালি চোখে দৃশ্যমান হওয়া আরেক জিনিস। একটি আরেকটির জন্য আবশ্যক নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, তারা দলিল ইস্তেদলালের ক্ষেত্রে ভুল করেছে। এমন একটি বিষয়কে আবশ্যক করেছে, যা সেই দলিলের সঙ্গে আবশ্যিক বা সম্পৃক্ত না।

মডার্নিস্টদের প্রায়ই দেখা যায়, পূর্ববর্তী আলেমদের কোনো একটা ব্যক্তিগত অভ্যাস বা ত্রুটিকে এনে সেই বিষয়টিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা বলতে চায়, এই কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ হলে তিনি করলেন কীভাবে? এ ক্ষেত্রেও তাদের ভুল ইস্তেদলাল হয়। কারণ, নবী-রাসুলগণ ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নন। সাহাবিদেরও নানা ভুলত্রুটি হয়েছে—আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন, সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। এর বাইরে উম্মাহর যত বড় আলেম, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির হন না কেন—তাদের দ্বারা সগিরা গুনাহ বা কবিরা গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, হয়েছেও। এখন তাদের এমন সব ঘটনা

নিজের জন্য অকল্যাণকর বিষয়ে দোয়া করে বসে, তখন আল্লাহ তা কবুল করেন না। অনেক সময়ে দোয়া একটু বিলম্বে কবুল হয়। দোয়া-সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রতিটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা জরুরি।

এনে কোনো অবৈধ বিষয়কে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না। কারণ, কারও ব্যক্তিগত কাজের দলিল থাকা মানেই কাজটি শরিয়তে বৈধ হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন, সাহাবায়ে কেরামের দ্বারাও দুয়েকটি জিনার ঘটনা ঘটেছে। এরপর তারা সাচ্চা দিলে তওবা করেছেন এবং শাস্তি গ্রহণ করে নিজেদের ক্ষমা মঞ্জুর করেছেন। এখন যদি কেউ এই ঘটনার দলিল দিয়ে জিনা-ব্যভিচারকে বৈধ করতে চায়, তা হলে তা অবশ্যই বড় ধরনের ভুল হবে।

৫. নতিজার বিশ্লেষণ

কারও বক্তব্য বা চিন্তাধারা বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল, নতিজা বা ফলাফলের বিশ্লেষণ। কোনো দলিলের মাধ্যমে ব্যক্তি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে, তা সঠিক কি না, সেটিও পর্যালোচনা করা জরুরি। দলিলের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল, বিপরীতমুখী দুটি বিষয় একসঙ্গে হতে পারে না। যেমন, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব—এই দুটি এক সঙ্গে হতে পারে না। একই সময় কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থাকবে, আবার অনস্তিত্বও থাকবে—এটি সম্ভব নয়। কারণ, অস্তিত্ব থাকলে তা অনস্তিত্বকে নাকচ করে, অনস্তিত্ব থাকলে তা অস্তিত্বকে নাকচ করে। এ সব ক্ষেত্রে যদি একটি বিষয় প্রমাণিত হয়, তা হলে বিপরীত বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, আমরা বিপরীত পক্ষের দলিলের ত্রুটি বুঝতে পারি না কিংবা সব প্রশ্নের জবাব সব সময় মাথায় থাকে না। ইস্তেদলালের ক্ষেত্রে তার কারসাজিও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে সমাধান হল, নতিজা পর্যালোচনা করে দেখা যে, এর বিপরীত ফলাফল আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না। যেমন, কেউ হয়তো বলল—আল্লাহর অস্তিত্ব নেই। তার দলিলের উপর পর্যালোচনা করতে না পারলে আমাদের উচিত আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা। যেহেতু দুটি বিপরীত বিষয় একত্রিত হতে পারে না, তাই আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে অনস্তিত্বের বিষয়টি এমনিতেই বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং নতিজা পর্যালোচনার সময় লক্ষ করতে হবে, এর বিপরীত কোনো নতিজা আছে কি না।

যে কোনো চিন্তা বোঝা বা খণ্ডনের ক্ষেত্রে এই মূলনীতিগুলো সামনে রাখলেই আমাদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এবার কিছু উদাহরণ দেখা যাক, যেখানে এই নীতিমালা প্রয়োগ করে আমরা কিছু চিন্তাধারা বোঝার চেষ্টা করব।

“মুসলমানরা বস্তুগত উন্নতিতে পিছিয়ে আছে। এ থেকে বোঝা যায়, তাদের ধর্ম সঠিক নয়।”

আমরা এই বক্তব্যকে দলিল, ইস্তেদলাল ও নতিজা আকারে ভাগ করব এবং মূলনীতি অনুসারে যাচাইয়ের চেষ্টা করব।

দলিল

মুসলমানরা বস্তুগত উন্নতিতে পিছিয়ে আছে।

দলিলের বিশ্লেষণ

—দলিলটি কি সঠিক?

—হ্যাঁ, সঠিক।

—দলিলের কি এমন কোনো দিক আছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি?

—হ্যাঁ, এখানে আরও দুটি বিষয় আছে। প্রথমত, পৃথিবীতে আরও অনেক জাতি, ধর্ম আছে—যারা বস্তুগত উন্নতিতে পেছানো। দ্বিতীয়ত, এক সময় মুসলমানরাই সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছে—ইউরোপ তখন তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই বিষয়টি প্রদত্ত দলিলের বিপরীত।

ইস্তেদলাল

সত্য ধর্মকে অবশ্যই বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

ইস্তেদলালের বিশ্লেষণ

—প্রদত্ত দলিলের জন্য এই ইস্তেদলালটি কি আবশ্যক নাকি আরোপিত?

—না, এই ইস্তেদলাল আবশ্যক নয়, বরং আরোপিত। কারণ, বস্তুগত উন্নতির বিষয়টি মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কৌশলের উপর নির্ভর করে। ধর্ম সঠিক হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কেউ বস্তুগত উন্নতি করলেই তার ধর্ম সঠিক হয় না। আবার কেউ পিছিয়ে পড়লেই তার ধর্ম মিথ্যা হয় না।

—প্রদত্ত দলিলে কি ভিন্ন কোনো ইস্তেদলাল করার সুযোগ আছে?

—হ্যাঁ। কেউ বস্তুগত উন্নতি করতে না পারলে এর অর্থ হল, সে বিষয়টি নিয়ে অবহেলা করছে। সঠিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে না। তা ছাড়া মানবজাতির ইতিহাসে উত্থান-পতন একটি স্বাভাবিক ধারা। মাধ্যম গ্রহণ করার উপর এটি নির্ভরশীল। এর সঙ্গে ধর্ম সঠিক হওয়া না হওয়া জড়িত নয়।

নতিজা

ইসলাম সত্য ধর্ম নয়।

নতিজার বিশ্লেষণ

—প্রদত্ত নতিজার বিপরীত কোনো নতিজা কি পাওয়া যায়?

—হ্যাঁ। ইসলাম ধর্ম যে সত্য, এ বিষয়ে প্রচুর আকলি ও নকলি দলিল বিদ্যমান। সামি আমেরি তার *বারাহিনুন নবুওয়াহ* গ্রন্থে এ সব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইসলাম ধর্মের শুদ্ধতা প্রমাণিত। যেহেতু একটি ধর্ম একই সঙ্গে সঠিক ও ভুল হতে পারে না, তাই বোঝা গেল, ইসলাম সত্য ধর্ম।

"ইসলাম মহিলাদেরকে হিজাব পরিধান করতে বলে, পুরুষদের নয়। যেহেতু নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা করা হয়নি, সুতরাং ইসলাম ইনসাফ ও ন্যায়ের ধর্ম নয়।"

দলিল

ইসলামে নারীদেরকে হিজাব পরিধান করতে বলা হয়েছে, কিন্তু পুরুষদের বলা হয়নি।

দলিলের বিশ্লেষণ

—দলিলটি কি সহিহ?

—হ্যাঁ। সহিহ।

—দলিলের কি এমন কোনো দিক আছে, যা উল্লেখ করা হয়নি?

—হ্যাঁ। অন্তত দুটি দিক এমন আছে, যা আড়াল করা হয়েছে। যেমন, ইসলামে শরিয়তে এমন কিছু বিধানও আছে, যেগুলো পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু নারীদের সেখানে ছাড় রয়েছে। যেমন: জিহাদ, ভরণপোষণ ইত্যাদি। আবার নারীদেরকে কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয়েছে, যা পুরুষদের দেওয়া হয়নি।

ইস্তেদলাল

পুরুষের পরিবর্তে নারীদেরকে হিজাব পরিধান করতে বলা তাদের উপর জুলুম।

ইস্তেদলালের বিশ্লেষণ

—এই ইস্তেদলাল কি প্রদত্ত দলিলের জন্য আবশ্যক?

—না, আবশ্যক নয়। কারণ, সমতা মানেই ইনসাফ নয়। বরং ইনসাফ হল, প্রত্যেক বিষয়কে তার হকদারের কাছে সঠিক মাপে পৌঁছে দেওয়া। সমতা অনেক সময় জুলুমের রূপ ধারণ করে। যেমন, একটি পরিবারে তিনজন সদস্য আছে। যাদের বয়স যথাক্রমে ৫, ১০ ও ৩০ বছর। এখন তাদের তিনজনকে যদি সমান পরিমাণে খাবার দেওয়া হয়, তা হলে এখানে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু এক-দুজনের উপর জুলুমও হবে। ইনসাফ হল, প্রত্যেককে তার বয়স ও চাহিদা অনুযায়ী খাবার দেওয়া। তিনজনের খাবারের পরিমাণ তখন সমান না হলেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে।

—দলিল থেকে কি ভিন্ন ইস্তেদলালের সুযোগ আছে?

—দলিল থেকে শরিয়ার বিধানের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। নারীদের মধ্যে পুরুষকে আকর্ষণ করার অপরিসীম ক্ষমতা আছে। তাদেরকে হিজাব করতে বলার অর্থ হল, এই বিষয়টিকে আটকে দেওয়া এবং সমাজকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে রক্ষা করা। নারীদের ক্ষেত্রে এই বিধানটি অত্যন্ত জরুরি ও যৌক্তিক।

নতিজা

ইসলাম নারীদের উপর জুলুম করে।

নতিজার বিশ্লেষণ

—এখানে কি বিপরীত কোনো নতিজা পাওয়া যায়?

—ইসলামের অনেক বিধান আছে, যেখানে নারীকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর সার্বিক নির্দেশনা থেকেই স্পষ্ট, ইসলাম নারীদেরকে সম্মান ও অধিকার দুটিই দিয়েছে। সুতরাং ইসলাম নারীদের উপর জুলুম করে—এই বক্তব্য স্পষ্ট ভুল।

“বেশির ভাগ পদার্থবিদ নাস্তিক। সুতরাং নাস্তিকতাই সঠিক।”

দলিল

বেশির ভাগ পদার্থবিদ নাস্তিক।

দলিলের বিশ্লেষণ

—দলিলটি কি সঠিক?

—এক বাক্যে বলার সুযোগ নেই। বরং ইতিহাসের সকল পদার্থবিদদের তালিকা করে এরপরে বিষয়টি পরিসংখ্যান করতে হবে। শুধুমাত্র আধুনিক পদার্থবিদদের নাম দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

—দলিলের কোনো অংশ কি আড়াল করা হয়েছে?

—হ্যাঁ, কয়েকটি বিষয় আড়াল করা হয়েছে। প্রথমত, পদার্থবিদদের মধ্যে অনেক মুসলিম বিজ্ঞানীও আছেন। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বেশির ভাগ পদার্থবিদই ধর্ম পালন করতেন। যেমন, নিউটনের কথা বলা যায়। বিংশ শতাব্দীতেও অনেক জাঁদরেল বিজ্ঞানী ছিলেন, যারা ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যেমন, আইনস্টাইন। তৃতীয়ত, পদার্থবিদ্যায় নাস্তিকতার সমর্থনে কোনো বক্তব্য নেই। নাস্তিকরা তাদের চিন্তা-দর্শনের কিছুই পদার্থবিদ্যা দ্বারা প্রমাণ করতে পারে না।

ইস্তেদলাল

বেশির ভাগ পদার্থবিদ যে অবস্থান গ্রহণ করবেন, সেটিই সঠিক।

ইস্তেদলালের বিশ্লেষণ

—এই ইস্তেদলাল কি প্রদত্ত দলিলের জন্য আবশ্যক?

—না। সংখ্যাধিক্যের উপর কোনো বিষয়ের ভুল-শুদ্ধি নির্ভর করে না। পদার্থবিদদের সকল সিদ্ধান্ত সঠিক হবে, এমন কথাও নেই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পদার্থবিদদের অনেক সূত্রও ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

—দলিল থেকে কি ভিন্ন ইস্তেদলালের সুযোগ আছে?

—অধিকাংশ পদার্থবিদের নাস্তিকতা গ্রহণ থেকে বোঝা যায়, পশ্চিমা সভ্যতায় ব্যাপক হারে নাস্তিকতা ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমে সাইন্টিজমকে ব্যাপকহারে গ্রহণ করা হচ্ছে, যেখানে বিজ্ঞানের জ্ঞানকেই একমাত্র পরম সত্য মনে করা হয়। এটি তাদের সঠিক অবস্থানের পরিবর্তে ধর্মহীনতাকেই প্রমাণ করে।

নতিজা

নাস্তিকতা সঠিক।

নতিজার বিশ্লেষণ

—এখানে কি বিপরীত কোনো নতিজা পাওয়া যায়?

—এমন প্রচুর আকলি ও নকলি দলিল আছে, যা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। নাস্তিকতাকে অসাড় প্রমাণ করে। এই বিপরীত দলিলের কারণে নাস্তিকতা ভুল প্রমাণিত হয়।

আলোচনা দীর্ঘ হবার আশঙ্কায় উদাহরণ এখানেই সমাপ্ত করতে হচ্ছে। পাঠকরা যদি বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা করেন, অনুশীলন করেন—তা হলে তাদের ক্রিটিক্যাল থিংকিং বেশ ধারালো হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

আকলের ব্যবহার : পরিচয় ও প্রকৃতি

আকলের স্বাভাবিক অর্থ—বুঝ-বুদ্ধি। আমরা যখন কারও ব্যাপারে বলি, তার আকল আছে—এর অর্থ হল, তার বুঝ-বুদ্ধি আছে; সে চিন্তা করতে সক্ষম। তবে আকলের পারিভাষিক পরিচয় ও সংজ্ঞা নিয়ে আলেমদের মধ্যে শুরু থেকেই নানা মতামত বিদ্যমান। এমনকি কেউ কেউ দাবি করেছেন, আকলের প্রায় এক হাজার সংজ্ঞা পাওয়া যায়![১]

জুয়াইনি বলেন, 'যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আকল মানে কী? তা হলে বলব, এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়।'[২] মূলত আকলকে শুধু নির্দিষ্ট একটি অর্থে ব্যবহার সম্ভব নয়।

ইমাম গাজালি বলেন, 'যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আকল মানে কী? তা হলে এর নির্দিষ্ট একটি অর্থ বলা নির্বুদ্ধিতা। কারণ, এই শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় এর মাধ্যমে বেশ কিছু ইলমকে বোঝায়। অনেক সময় এর দ্বারা মানুষের বুঝ-বুদ্ধি বোঝায়, যা দ্বারা সে কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে পারে এবং নানা জ্ঞানকে ধারণ করতে পারে। অনেক সময় এর দ্বারা মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেও বোঝায়। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করেনি, তাকে আকেল বলা হয় না। যার অর্জিত ইলম ও আমলে সমন্বয় আছে, তাকে আকেল বলা হয়। যার ইলমের সঙ্গে আমলের সমন্বয় নেই, তাকে আকেল বলা হয় না। যেহেতু এর পারিভাষিক অর্থেই নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়, সুতরাং এর সীমা নির্ধারণেও তা প্রভাব ফেলে।'[৩]

ইবনে তাইমিয়ার মতে আকল বলা হয় মূলত চারটি বিষয়কে :

১. ইলম ধারণের স্বাভাবিক ক্ষমতা, যা একজন পাগল ও স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। পাগলের আকল নেই, সুস্থ মানুষের আছে। অর্থাৎ এটি মানুষের ইন্দ্রিয়জাত বুঝ-বুদ্ধি।

---

১. *আল-বাহরুল মুহিত জারকাশি*, ১/৮৪

২. *আল-বুরহান*, ১/৯৫

৩. *আল-মুস্তাসফা*, ১/৬৪

২. এমন জ্ঞান, যা মানুষকে ভালো-মন্দের বুঝ দেয়। লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়।

৩. ইলম অনুসারে আমল। জ্ঞান অনুসারে কাজ। যেমন, এক ব্যক্তি জানল, রাসেল ভাইপার একটি বিষাক্ত সাপ। এটি মানুষকে কামড় দিলে মানুষ মারা যায়। রাসেল ভাইপারের এই স্বভাব ও পরিচয় জেনেও সে রাসেল ভাইপারের সামনে গিয়ে কামড় খেয়ে মারা গেল। অর্থাৎ অর্জিত জ্ঞান অনুসারে সে সতর্কতা অবলম্বন করেনি। এ ক্ষেত্রে যে কেউ বলবে, লোকটার আকল ছিল না কিংবা সে আকল কাজে লাগায়নি।

৪. মানুষের এমন স্বভাব, যা দ্বারা মানুষ কোনো বিষয় অনুধাবন করতে পারে।

যে কোনো আলোচনা-পর্যালোচনায় আকলের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামি শরিয়ার উপর যে আপত্তিগুলো তোলা হয়, এর অনেকগুলোই আকলপ্রসূত। এর প্রবক্তারা সাধারণত আকলকে চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্য বিষয় হিসাবে প্রচার করে নিজেদের কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায়। অনেক সময় তাদের কথার জবাব দিতে গিয়ে আমাদেরকেও আকল ব্যবহার করতে হয়। তবে মানুষের আকলের একটা সীমা আছে। এই সীমার বাইরে সে কাজ করতে সক্ষম নয়। এ জন্য সংক্ষেপে আকলের কর্মপরিধি ও সীমা জেনে নেওয়া দরকার।

শায়খ আবদুর রহমান শাহরি বিস্তারিত আলোচনা শেষে দেখিয়েছেন যে, আকলের মৌলিক বিষয় চারটি :

১. মানুষের সহজাত স্বভাব-প্রকৃতি, যা দ্বারা সে কোনো বিষয় অনুধাবন করে।

আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, 'আকল হল সহজাত স্বভাব-প্রকৃতির নাম।'[১]

ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'আহমদ ইবনে হাম্বল ও হারিস আল-মুহাসিবির আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আকল হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব-প্রকৃতি।'[১]

---

১. *আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ*, ১/৮৬

ইমাম গাজালির মতে, আকল হচ্ছে সেই বিষয়, যার কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। একই ধরনের মন্তব্য করেছেন ইমাম মাওয়ারদিও।[২]

২. আকলের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। মানুষ তার ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কিছু বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে। যেমন: দুই একের চেয়ে বড়; আগুন সব সময় গরম হয়; একজন ব্যক্তি একই সময়ে দুই স্থানে অবস্থান করতে পারে না; একটি বিষয় একই সময় অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বে থাকতে পারে না। এই সবগুলো বিষয়ে মানুষ একমত। বিষয়গুলো তারা আকল ব্যবহার করেই অনুধাবন করতে পারে। এগুলো এমন জ্ঞান, যা প্রমাণ করার জন্য দলিলের প্রয়োজন হয় না। সকল মানুষের কাছেই স্বতঃসিদ্ধভাবে এগুলো প্রমাণিত। এটাকে সাধারণত 'আল-উলুমুজ জরুরিয়া' বা 'আল-বাদাহিয়াতুল আকলিয়া' বলা হয়।

৩. অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কাজ। সালাফদের অনেকেই আকলকে এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। কারণ, কাজের মাধ্যমেই আকলের ক্রিয়া ও প্রভাব প্রকাশ পায়। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, 'ওই ব্যক্তি আকেল নয়, যে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। বরং আকেল হল সে, যে ভালোকে বুঝতে পারে এবং তা অনুসারে কাজ করে এবং খারাপকে বুঝতে পেরে তা থেকে বিরত থাকে।'[৩]

কোনো একটি চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য আকলের এই তিন স্তরের প্রতিটিই কিন্তু ধর্তব্য নয়; প্রথম ও তৃতীয় স্তরটি অনেক সময় ভুল করে, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়! অর্থাৎ এগুলো কতয়ি বা অকাট্য নয়, বরং জন্নি বা অনুমাননির্ভর; কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মানুষ যা অর্জন করে, অনেক সময় কতয়ির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। নুসুসে শরিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, কিছু বিষয় আছে জন্নি, কিছু আছে কতয়ি। সাধারণত শরিয়ার বিভিন্ন বিধান ও বক্তব্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য

---

১. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ৯/২৮৭। এ বিষয়ে হারিস আল-মুহাসিবির বক্তব্য জানতে দেখুন—*আল-আকল ওয়া ফাহমুল কুরআন* , ২০১

২. *ইহইয়াউ উলুমিদ দ্বীন*, ১/৮৫; *আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন*, ৪

৩. *কিতাবুল আকলি ওয়া ফাদলিহি*, ৫১

প্রচার করা হয়—এটি আকলবিরোধী। কিন্তু বাস্তবতা হল, আকলের সবটা কতয়ি নয়, সুতরাং আকলবিরোধী হলেও বিশেষ কোনো সমস্যা নেই!

শায়খ মুতলাক আল-জাসির একটি সাধারণ মূলনীতি বলেছেন। মূলনীতিটি হল :

১. কতয়ি নকলি দলিল জন্নি আকলি দলিলের বিপরীত হলে নকলি দলিলটা গৃহীত হবে।

২. জন্নি নকলির সঙ্গে কতয়ি আকলির বিরোধ হলে আকলি দলিল গৃহীত হবে।

৩. জন্নি নকলির সঙ্গে জন্নি আকলির বিরোধ হলে সার্বিক বিবেচনায় কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

৪. কতয়ি নকলির সঙ্গে কতয়ি আকলির বিরোধ হওয়া কখনওই সম্ভব নয়। এর দলিল হল ইবনে তাইমিয়ার একটি বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেছেন, 'দুটি কতয়ি বিস্ময়ের মধ্যে কখনও বিরোধ হওয়া সম্ভব নয়। দুটি কতয়ি আকলি বা দুটি কতয়ি নকলি বা কতয়ি আকলির সঙ্গে কতয়ি নকলির বিরোধ অসম্ভব।'[১] ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'দুটি আকলি ও নকলি যখন মুখোমুখি হয়, তখন দুটিই জন্নি হয় কিংবা একটি জন্নি হয়, অন্যটি কতয়ি হয়। এর বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়।'[২]

সাম্প্রতিক কালে ইসলামি শরিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন তুলে বলা হয়, এগুলো আকলপরিপন্থি। এই ধরনের কথা বড় মাপের ভুল। কারণ, আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, আকলকে নির্দিষ্ট একটি অর্থে ব্যবহারের সুযোগ নেই। আকলের অন্তত তিনটি অর্থ আছে; এর প্রতিটির সীমা ও গ্রহণযোগ্যতা আবার ভিন্ন ভিন্ন। বিভ্রান্ত মতাবলম্বীরাও বিষয়টি জানে। কিন্তু নিজেদের কথাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আকলের প্রকারভেদের আলাপ এড়িয়ে যায় তারা! শরিয়ার কোন বিধান কোন ধরনের আকলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তা নির্দিষ্ট করে না বলে তারা বলে দেয়—এটি আকলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু আকলের দ্বিতীয় প্রকার, অর্থাৎ আল-বাদাহিয়াতুল আকলিয়া, এটি কখনও শরিয়ার

---

১. *দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকলি*, ১/৭৯

২. *মুখতাসারুস সায়ায়িকিল মুরসালাহ*, ১/২৪৭

সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না। হ্যাঁ, উপস্থাপনের ভুল কিংবা বোঝার ভুলের কারণে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে, কিন্তু মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক নয়।

আকলের ব্যবহার ও এর সীমা সম্পর্কে জানা জরুরি। সালাফদের জীবনীতেও দেখা যায়, বাতিলপন্থিদের রদের ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা আকলি দলিলের সাহায্য নিয়েছেন। যেমন: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. জাহমিয়াদের খণ্ডনের ক্ষেত্রে,[১] ইমাম কিনানি রহ. বিশর মারিসিকে খণ্ডনের ক্ষেত্রে,[২] ইবনে তাইমিয়া রহ. বিভিন্ন বাতিল ফেরকাকে খণ্ডনের ক্ষেত্রে।[৩] সমকালীন নানা বিভ্রান্তিকর চিন্তা অপনোদনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আকলের সঠিক ব্যবহার ও এর পরিধি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ইমাম শাতেবি রহ. বলেন, 'কারও আকল যদি শরিয়ার অনুগামী না হয়, তা হলে প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।'[৪]

---

১. বিস্তারিত জানতে দেখুন—*বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়া*, ২/৫৪৬

২. বিস্তারিত জানতে দেখুন—*আল-হাইদাহ ওয়াল ইতিজার*, ১২৫-১২৯

৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন—*দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকলি*, ১/২৯-৩০

৪. *আল-ইতিসাম*, ১/৫১

সমকালীন বিভ্রান্তি : উৎস ও প্রতিকার

উৎস

সমাজে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ছে নানা সংশয়। হাজার বছরের পুরনো নানা মতবাদ হাজির হচ্ছে নতুন মোড়কে। সেক্যুলারধারায় গড়ে-ওঠা প্রজন্ম এ সব সংশয় লুফে নিচ্ছে খুব দ্রুত। কেউ পা বাড়াচ্ছে নাস্তিকতার দিকে, কেউ অস্বীকার করছে হাদিসের প্রামাণ্যতা, কেউ শরিয়ার ব্যাখ্যা করছে হাজার বছরের ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রকে পাশ কাটিয়ে—সব মিলিয়ে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি! সব সংশয় ও বিভ্রান্তির গতি-প্রকৃতিও এক নয়; কোনোটা আসছে শরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে, কোনোটা আবার শরিয়া পালনের নামে। এ সব বিভ্রান্তি ও সংশয়ের উৎস চেনা না গেলে প্রতিকার নির্ণয় করার কাজটি হয়ে উঠবে দুরূহ!

সমকালীন বিভ্রান্তি ও সংশয় নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এ সবের উৎস কয়েকটি বিষয়। সংক্ষেপে সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক!

১. বহিরাগত প্রভাবক

ক) সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম

সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম, যেমন: ইউটিউব, টুইটার, স্কাইপি, ফেসবুক ইত্যাদি মূলত দু-ধারি তলোয়ারের মতো। ব্যবহারের উপর নির্ভর করছে এ সবের প্রতিক্রিয়া। এ সব মাধ্যমের কারণে পৃথিবীর এক স্থানের চিন্তা দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে অন্য স্থানে। আগে একটি চিন্তা ও মতবাদ প্রচার পেতে সময় লেগে যেত বছরের পর বছর; কিন্তু এখন যে কোনো চিন্তা খুব দ্রুত পেয়ে যাচ্ছে অনুসারী। নতুন নতুন মতবাদ ও বিভ্রান্তির প্রবক্তারা সক্রিয় আছেন এ সব মাধ্যমে; খুব সহজেই প্রচার করছেন তাদের চিন্তাধারা। ইলমহীন জাহেল প্রজন্ম লুফে নিচ্ছে তাদের চিন্তাধারা; এমনকি নিজেরা অবতীর্ণ হচ্ছে প্রচারকের ভূমিকায়! যে কোনো নেতিবাচক চিন্তাধারা খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে

ওঠে; এ সব যোগাযোগ-মাধ্যমে তো তা আরও বেড়েছে। ফলে তরুণদের একাংশ একে কাজে লাগাচ্ছে জনপ্রিয়তার মাধ্যম হিসাবে। তারা চ্যালেঞ্জ করছে প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্সকে। প্রশ্নবিদ্ধ করছে ইসলামি তুরাস ও আলেম-সমাজকে। ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো এ সব উদ্যোগ থেকে শত ভাগ ফায়দা তুলতে সচেষ্ট। তারা নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে এ সব কর্মকাণ্ডকে।

বাংলাদেশে গত দেড় দশকের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ করলে দেখা যাবে—ব্লগ, ফেসবুক, ইউটিউবকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রচারের কাজে। নাস্তিক্যবাদীরা তো আগ থেকেই এ সব মাধ্যমে সক্রিয় ছিল—আজকাল এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কুরআনিস্ট, মডার্নিস্ট, কাদিয়ানি, হেযবুত তওহীদ, এমনকি খ্রিষ্টান মিশনারিরাও! প্রতিনিয়ত তাদের নানা ফাঁদে পা দিচ্ছে সহজ সরল মুসলমানরা।

খ) চলচ্চিত্র ও সাহিত্য

মুসলিম-অধ্যুষিত যে কোনো দেশের চলচ্চিত্র ও সাহিত্যপাড়ার খোঁজ নিন, দেখবেন—সেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে প্রমোট করা হচ্ছে! ব্যঙ্গ করা হচ্ছে ইসলামের শিআর নিয়ে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে ধর্মীয় সমাজের ব্যাপারে! বাংলাদেশের পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। নাটক, সিনেমা ও উপন্যাসের মাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে অশ্লীলতা; মুসলিম-সমাজের সকল মূল্যবোধ ভেঙে সেখানে বসানোর চেষ্টা চলছে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও জীবনধারা।

গত পাঁচ দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, একটি রক্ষণশীল মুসলিম-সমাজকে কীভাবে আধুনিক-মুক্ত সংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! এখানে ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে উঠছে ইসলামি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের মাধ্যমেও বীজ রোপণ করা হচ্ছে নানা বিভ্রান্তির। নানা অসুস্থ চিন্তা ছড়ানো হচ্ছে সমাজে। প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে শরিয়ার নানা বিধানের যৌক্তিকতাকে। নিজের অজান্তেই প্রভাবিত হচ্ছে পাঠক ও শ্রোতার মস্তিষ্ক।

ধর্মীয় সমাজ তাকওয়ার কারণে চলচ্চিত্রের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে গেলেও সাহিত্যের কুপ্রভাব থেকে বাঁচা অনেক সময় সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যায়, বামপন্থি সেক্যুলার বা উগ্র হিন্দুত্ববাদী অনেক লেখকের লেখা এখানে জনপ্রিয়। এ সব লেখক তাদের

লেখায় কৌশলে ধর্মকে ছোট করে উপস্থাপন করেন। ধার্মিকদের উপস্থাপন করেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ শ্রেণি হিসাবে। ধার্মিক সমাজের একাংশ অনেক সময় সাহিত্য হিসাবে এ সব বইপত্র পড়েন এবং নিজের অজান্তে নানা বিভ্রান্ত চিন্তা গ্রহণ করেন। সাহিত্য কখনওই নিছক বিনোদন নয়, সাহিত্যও হয়ে ওঠে চিন্তা প্রচারের হাতিয়ার।

গ) বিদেশে উচ্চশিক্ষা

প্রতি বছর মুসলিম তরুণদের একটি বড় অংশ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পাড়ি জমাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে। সেখানে তারা অমুসলিম, এমনকি ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষকদের ক্লাসে বসছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, সেক্যুলারধারায় বেড়ে ওঠার কারণে এই তরুণদের বেশির ভাগের কাছে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস স্পষ্ট নয়। ফলে তারা খুব সহজেই প্রভাবিত হচ্ছে নিজেদের অমুসলিম শিক্ষকদের মাধ্যমে, গ্রহণ করছে তাদের চিন্তাধারা! উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে দেশে ফেরার সময় তারা শুধু সার্টিফিকেট নিয়েই ফিরছে না, বরং আমদানি করছে নানা বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা। নিজেদের এ সব সংস্কৃতি তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে মুসলিম-সমাজে। উপস্থাপিত হচ্ছে একের পর এক প্রশ্ন।

প্রযুক্তির কল্যাণে বিদেশি স্কলারদের আলোচনাও এখন সর্বত্র সহজলভ্য। চাইলেই পাঠ করা যায় ওরিয়েন্টালিস্টদের রচিত বইপত্রও। ফলে মুসলিম-সমাজের একাংশ সহজেই প্রভাবিত হচ্ছে তাদের মাধ্যমে। গত শতাব্দীতে এই ধরনের প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিলেন ড. আহমদ আমিন। আহমদ আমিন ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে অনেক লেখালেখি করলেও আকিদা-বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মানহাজচ্যুত। তার লেখাজোখায় ইসলামের ইতিহাসের মূল আবেদনই হারিয়ে যায়। নির্দ্বিধায় তিনি প্রচুর হাদিস অস্বীকার করেছেন, মুতাজিলাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমকালীন আলেমদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

আহমদ আমিনের বিভ্রান্তির সূচনা হয়েছিল অমুসলিম লেখকদের লেখাজোখা পাঠের মাধ্যমেই। আহমদ আমিন নিজেই স্মৃতিচারণ করেছেন, ‘আমি আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ম্যাকডোনাল্ডের লেখা পড়ে প্রভাবিত হই। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, আমি ইংরেজি শিখে মূল থেকেই তার বই পড়ব।’[১] যে

---

১. *হায়াতি*, ১০৭

বই পড়ে আহমদ আমিন এত মুগ্ধ হন, তা ছিল ম্যাকডোনাল্ডের লেখা *ডেভেলপমেন্ট অব মুসলিম থিউলজি*। আহমদ আমিনের *ফজরুল ইসলাম* গ্রন্থের নানা জায়গায় এই বইয়ের রেফারেন্স দেখা যায়। আহমদ আমিন যদিও তার লেখায় সাধারণত রেফারেন্সের প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না, কিন্তু এই বইয়ের নাম বারবার উল্লেখ করা থেকে বোঝা যায়, এর বিষয়বস্তু বা লেখকের প্রতি তার ছিল অতিরিক্ত মুগ্ধতা।

শায়খ ইবরাহিম সাকরান লিখেছেন, 'ম্যাকডোনাল্ডের বইয়ের প্রতি আহমদ আমিনের এই মুগ্ধতার কারণ এটা নয় যে, সেখানে নতুন কোনো চিন্তা বা তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। বরং মূল বিষয়টি হল, এটি প্রাচ্যবিদদের লেখা প্রথম বই, যা আহমদ আমিন মূল ভাষা থেকে পড়েছিলেন।'[১] প্রথম জিনিসের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা মুগ্ধতা বা ভালোবাসা জন্ম নেয়, যাকে প্রাইমারি ইফেক্ট বলে। আহমদ আমিন এ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। ম্যাকডোনাল্ডের বইপাঠের মাধ্যমে তার মনে প্রাচ্যবাদের প্রতি যে মুগ্ধতা জন্ম নেয়, পরবর্তী দিনগুলোতে এ মুগ্ধতা আরও গাঢ় হয়েছিল। আহমদ আমিন নিজেই পরে স্বীকার করেছেন, গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি প্রাচ্যবাদীদের দেখানো পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন![২] প্রাচ্যবাদী রচনার প্রভাবে আহমদ আমিনের চিন্তাধারাও বিকৃত হয়ে ওঠে। তিনি হাদিসশাস্ত্র ও মুহাদ্দিসদের উপর বেশ কিছু আপত্তি তোলেন, যা মূলত প্রাচ্যবাদীদের কাছ থেকে ধার করা।

সাম্প্রতিক কালে মুসলিম-সমাজে নানা সংশয় ও সন্দেহ ছড়ানোর মূলে রয়েছে প্রাচ্যবাদী গবেষণার ধারা। এ সব গবেষণাপদ্ধতির বাহ্যিক চাকচিক্যময় আবরণের ভিতরে রয়েছে ঈমান-আকিদাবিধ্বংসী নানা সূত্র। যারা এ সব গবেষণাপদ্ধতিকে শত ভাগ নির্ভুল মনে করে, সেই আলোকে নবীজির সিরাত, হাদিসশাস্ত্র বা ইসলামের ইতিহাস পাঠ করতে যায়—তারা নানাভাবে বিভ্রান্ত হন। ইসলামের ইতিহাসের কথাই ধরা যাক! সালাফে সালেহিন ইতিহাস বিশ্লেষণের মৌলিক নীতিগুলো বলে গেছেন। সনদ ও মতনের উপর কী কী নকদ হতে পারে, তার ধারা উল্লেখ করেছেন। এখন কেউ যদি সে সব মূলনীতি বাদ দিয়ে মার্ক্সিজমের দেখানো পথে ইতিহাস বিশ্লেষণ করে কিংবা সাব অল্টার্নদের দেখানো পথ বেছে নেয়, তা হলে তার গবেষণা মারাত্মক ভুল পথে প্রভাবিত হবে।

---

১. *আত-তাবিলুল হাদাসি লিত তুরাস*, ৪৬

২. *হায়াতি*, ১০৬

ঘ) পাপাচার ও সামাজিক অবক্ষয়

আমরা যে সময়ে বাস করছি, তাতে পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। ক্রমেই উধাও হচ্ছে মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তি। সেখানে স্থান নিচ্ছে পাপাচার ও অশ্লীলতা। অনলাইন ও নানা মাধ্যমের কারণে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে পাপ করা এখন সহজ। প্রতিটি পাপ এখন একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সব পাপাচার আকৃষ্ট করছে মানুষের নফসকে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের রক্ষণশীল কাঠামো থেকে বের হয়ে সরাসরি পাপাচারে মগ্ন হওয়া সহজ নয়। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকে দাঁড় করাচ্ছে নিত্যনতুন ব্যাখ্যা। কেউ গান-বাজনাকে বৈধ বলছে, কেউ সিনেমা দেখাকে জায়েজ বলছে, কেউ পর্দার বিষয়ে নানা অন্যায় শিথিলতা করতে বলছে। এ সব কাজের মূল উদ্দেশ্য নিজের নফসের চাহিদা পূরণ করা। এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত শরিয়ার উপর সরাসরি প্রশ্ন না তুলে শরিয়ার বিধানকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে। তারা সালাফে সালেহিনের সকল ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে নিজেদের অবস্থানকেই চূড়ান্ত সঠিক ব্যাখ্যা বলে স্বীকৃতি দেয়। যখন কারও মধ্যে পাপাচার বৃদ্ধি পায় এবং তওবা হ্রাস পায়, তখন আল্লাহ তার অন্তরকে কলুষিত করে দেন। হকের পথ থেকে সে সরে যায়। হেদায়েতের নির্মল বাণী গ্রহণ করার অবস্থায় আর সে থাকে না। তার অন্তরে ঈমানের স্বাদ কমতে থাকে। নিজের নফস ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

আবু হাফস আমর বিন সালামা নিশাপুরি বলেন, 'গুনাহ হল কুফরির দূত।'[১]

ইবনে রজব হাম্বলি বলেন, 'যে ব্যক্তি তওবা না করে গুনাহের উপর অটল থাকে—আশঙ্কা আছে, তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হবে! সে নিরেট মুনাফিকে পরিণত হবে এবং তার শেষ পরিণতি হবে মন্দ। এ জন্যই বলা হয়, গুনাহ হল কুফরির দূত।'[২]

হুজাইফা রাজি.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বনি ইসরাইল কি এক দিনে তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করেছিল?' তিনি জবাব দেন, 'না। বরং তাদেরকে যে কাজের আদেশ দেওয়া হত, তারা তা থেকে বিরত থাকত। যেই কাজে নিষেধ

---

১. *শুয়াবুল ইমান*, ৯/৩৮৪

২. *ফাতহুল বারি লি ইবনে রজব*, ১/১৯৭

করা হত, তাতে লিপ্ত হত। এভাবে তারা দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, যেভাবে একজন মানুষ তার শরীর থেকে জামা খুলে ফেলে!'[১]

৬) পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব

ইবনে খালদুন লিখেছেন, 'বিজিত জাতি সব সময় বিজয়ীদের অনুসরণ করে।'[২]

গত এক শতাব্দীতে মুসলিমবিশ্বের পরিস্থিতি দেখলে এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। খেলাফত পতনের পর থেকেই মুসলিম-সমাজের একটি অংশ পশ্চিমা নানা মতবাদের একনিষ্ঠ ব্যাখ্যাকারে পরিণত হয়েছেন। যখন যে মতবাদের প্রাবল্য দেখছেন, তখন সেই মতবাদ অনুসারে ইসলামকে ব্যাখ্যা করছেন তারা। কমিউনিজমের রমরমা সময়ে মুসলিম গবেষকদের একাংশের দাবি ছিল—সমাজতন্ত্র মূলত ইসলাম থেকেই আহরিত, এর সঙ্গে ইসলামের সংঘর্ষ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এ সব আলাপ আলোচনা কমে গেছে। এখন চলছে ইসলামকে গণতান্ত্রিক ও লিবারেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ।[৩] প্রায়ই দাবি করা হচ্ছে, গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই, দুটিই মূলত এক বিষয়ের দুই নাম। লিবারেলিজম ইস্যুতে বলা হচ্ছে—ইসলাম মূলত মানুষকে লিবারেল হতেই নির্দেশ দেয়! এ সব ব্যাখ্যার পিছনে একমাত্র কারণ হল পরাজিত মানসিকতা, নিজেকে বিজয়ীদের রঙে রাঙিয়ে নেওয়ার প্রবণতা।

এটি মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। সে সব সময় বিজয়ীকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত থাকে। গত একশ বছরে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের মুখে অসহায় মুসলিমবিশ্ব। মুসলমানদের একাংশ তাই নানা বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেকে পশ্চিমা সভ্যতার কাছাকাছি প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রবণতার উদাহরণ হিসাবে মিশরের মুহাম্মদ আবদুহুর কথা বলা যায়। বিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের লেখনী ও চিন্তার মাধ্যমে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, আবদুহু তাদের একজন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন জামালুদ্দিন আফগানির চিন্তা দ্বারা তুমুলভাবে প্রভাবিত। আফগানি ও আবদুহু মুসলমানদের পুনর্জাগরণ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, এতে কোনো

---

১. *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৭৮

২. *আল-মুকাদ্দিমা*, ১/২৮৩

৩. *আদ-দাউলাহ ওয়াস সিয়াদাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি*, ১৮

সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাদের কর্মপদ্ধতি ছিল ভুল। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোকাবেলায় ইসলামকে বিজয়ী করতে তারা ইসলামের পাশ্চাত্যপ্রভাবিত ব্যাখ্যা শুরু করেন, যা থেকে অনেক বিকৃতি জন্ম নেয়। সচেতন অমুসলিম গবেষকরাও বিষয়টি ধরতে পেরেছিলেন। বিখ্যাত লেখক আলবার্ট হুরানি লিখেছেন, 'মুহাম্মদ আবদুহু চেয়েছিলেন ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যখানে একটি দেয়াল নির্মাণ করতে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন!'[১]

এটি একটি সাধারণ নিয়ম যে, বিজয়ী সভ্যতা পরাজিতদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। যখন ইসলাম বিজয়ী ছিল, তখন ইউরোপিয়ানরা ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা মারাত্মক প্রভাবিত ছিলেন। এই প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ধরা যায় আন্দালুসকে। মুসলিম শাসনের যুগে ইউরোপিয়ানরা আন্দালুসে পড়তে আসত। এখানকার মুসলমান শিক্ষকদের দ্বারা অনেকে তীব্র প্রভাবিত হত। কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করত, অন্যরা ধর্ম গ্রহণ না করলেও মুসলমানদের সংস্কৃতি গ্রহণ করত। ৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান যাজকরা লক্ষ করেন, খ্রিষ্টান যুবকদের মধ্যে আরবি কাব্যের প্রতি তুমুল আগ্রহ জন্ম নিয়েছে। তরুণদের এই বিষয় থেকে বিরত রাখার জন্য অনেক স্থানে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।[২]

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে বাইতুল মাকদিস জয়ের পর যে ক্রুসেডাররা মুসলিম ভূমিতে বসবাস করছিল, তারাও মুসলমানদের কৃষ্টি কালচার ও সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয়। ড. মাহমুদ সাইদ ইমরান বিস্তৃত গবেষণা করে দেখেছেন, এ সময় ক্রুসেডাররা পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের দিকেও মুসলমানদের অনুসরণ করতে থাকে।[৩]

২. অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

ক) একিনের সংকট

একিন বলা হয় দৃঢ় বিশ্বাসকে। ইলম ও আমলের সমন্বয় যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের একিন তত বৃদ্ধি পায়। অর্জিত ইলমের সঙ্গে আমলের সমন্বয় না হলে দেখা দেয় একিনের সংকট। একিনের সংকট থাকার মানে, ব্যক্তি যে কোনো

---

১. *আল-ফিকরুল আরাবি ফি আসরিন নাহদাহ*, ৪১০
২. *তাসিরুল ইসলাম ফি উরুববা আল-উসুরুল উসতা*, ৫৭
৩. *তারিখুল হুরুবিস সালিবিয়া*, ২৩৭

মুহূর্তে কোনো বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মুসলিম-সমাজের একটি বড় অংশের একিন দুর্বল হওয়াসত্ত্বেও তারা কুফর কিংবা ইলহাদের জালে আটকা পড়েনি, এর মূল্য কারণ হল, তাদের সামনে এ সব বিভ্রান্তি কেউ উপস্থাপনই করেনি। যদি উপস্থাপন করা হত, তা হলে অনেকেই নিজেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হত না! অনেকেই ঈমান হারিয়ে বসত!

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষ যখন কুফরি থেকে ইসলামে প্রবেশ করে কিংবা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং শরিয়ত পালনে সচেষ্ট হয়, তখন সে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা মুসলমান, তাদের অন্তরেও ঈমান প্রবেশ করেছে; কিন্তু ঈমানের হাকিকত তাদের অন্তরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে। যদি আল্লাহ কাউকে এটি দান না করেন, তা হলে অনেকেই একিনের গভীর স্তরে পৌঁছুতে পারে না। তাদের সামনে যদি কোনো সন্দেহ-সংশয় উপস্থাপন করা হয়, তারা তাতে পতিত হয়।'[১]

খ) ব্যক্তিগত টানাপোড়েন ও যাপিত জীবনের সংকট

মানুষের জীবনধারা মসৃণ নয়। এখানে আছে নানা উত্থান, পতন ও সংকট। সুখের সঙ্গে আছে দুঃখ, হাসির পরে কান্না। একজন আদর্শ মুমিন জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে রবের সন্তুষ্টি তালাশ করে। নেতিবাচক পরিস্থিতিতে সে হতাশ হয় না, ভেঙেও পড়ে না—বরং পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য দোয়া ও চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু দুর্বল ঈমানের লোকজনের বিষয়টি ভিন্ন। তারা অনেক সময় ভেঙে পড়ে এবং পুরো পরিস্থিতির জন্য আল্লাহকেই দায়ী করতে থাকে! নাউজুবিল্লাহ!

ইসলাম থেকে যারা নাস্তিক্যবাদের পথ বেছে নিয়েছে, তাদের একাংশ মূলত ব্যক্তিগত হতাশার শিকার। তাদের এ ধরনের অভ্যাসের কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

---

১. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ৭/২৭০

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে। আর যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।[১]

শায়খ ইবনে সাদি এই আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, 'এখানে ওই সব লোকজনের কথা বলা হয়েছে—যাদের ঈমান দুর্বল, ঈমান পরিপূর্ণভাবে তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যখন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়, তখন তারা এতে সন্তুষ্ট হয়। আর যখন তাদের অপছন্দনীয় পরিস্থিতির সূচনা হয়, তখনই তারা দ্বীন থেকে সরে যায়।'[২]

মূলত দুর্বল ঈমানের কারণেই মানুষ তার জীবনের সংকট মেনে নিতে পারে না। তাকদিরের প্রতি স্থির বিশ্বাসের অভাব তাকে টেনে নেয় বিভ্রান্তির দিকে। কখনও নাস্তিক্যবাদ, কখনও ধর্মহীনতা হয়ে ওঠে তার শেষ আশ্রয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন বলেন, 'বেশির ভাগ নাস্তিক আসলে মন থেকে নাস্তিক নয়। কোনো কারণে আল্লাহর প্রতি তার একটা রাগ আছে; এই রাগ থেকে সে নাস্তিক।'[৩]

গ) আত্মশুদ্ধির অভাব

মুসলিম-সমাজে বেড়ে উঠেও অনেকে আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে থাকে বেখবর। বিভিন্ন ইবাদত পালন করলেও আত্মার রোগ-ব্যাধির নিয়াময় নিয়ে তারা গুরুত্ব দেয় না। হিংসা, অহংকার এগুলো অন্তরে দানা বাঁধে। ক্রমে সেই দানা বড় হয় এবং নানা বিভ্রান্তির পথ খুলে যায়। অনেক সময় মানুষ নিজের ভুল অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করতে একের পর এক বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে,

---

১. সুরা হজ, ১১

২. *তাফসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান*, ৫৩৫

৩. বেশির ভাগ নাস্তিকের বক্তব্য পর্যালচনা করলে দেখা যায়, কোনো কারণে তাদের মনে হয়েছে, আল্লাহ তাদের বঞ্চিত করেছেন বা তাদের উপর জুলুম করেছেন। এ কারণে তারা আল্লাহকেই অস্বীকার করে বসে! কয়েক বছর আগে বামপন্থি বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি যে ধর্মে আস্থা হারালাম, ঈশ্বর বা আল্লাহর উপর আস্থা হারালাম, এটা কিন্তু তত্ত্বগত কোনো কারণে নয়। আমার মনে হল, মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা কেন? এক দিকে বলা হয়, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। আবার বলা হয়, তিনি দয়ালু এবং সর্বশক্তিমান। আমার কথা হল, এই তিন গুণ যদি একজনের থাকে, তা হলে দুনিয়ার এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা যায় না।' (বিস্তারিত জানতে দেখুন—*বেলা অবেলা সারাবেলা*, আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

পিছনে থাকে কথিত ইগো ও পারসোনালিটির প্রভাব। নিত্যনতুন বিভ্রান্তি গ্রহণের আরেক কারণ—আত্মশুদ্ধির অভাব বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা।

ঘ) বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার দুর্বলতা

নিত্যনতুন মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আরেকটি কারণ হল, সঠিক পর্যালোচনা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অভাব। যে কোনো মতবাদকে ভালো করে না বুঝেই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে চলে আসেন অনেকে। কিছু মতবাদ ও বিভ্রান্তি এমন আছে, যার কিছু শাখা বাহ্যত ইসলামের কাছাকাছি মনে হয়। অনেকে এ সব শাখা দেখেই মূল বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেন। প্রায়ই তাদের এ সব সিদ্ধান্ত ভুল হয় এবং জন্ম নেয় নতুন বিভ্রান্তি। এমনটা হয় সঠিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের অভাবে। অনেক সময় মুখলিস ব্যক্তির মাধ্যমেও এমন বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে—যদি তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী না হন।

ঙ) শরয়ি ইলমের শূন্যতা

উপনিবেশ শাসন সমাপ্ত হওয়ার পর মুসলিমবিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থা দুই ধারায় ভাগ হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষা নামে কথিত একটি ধারার সূচনা হয়, যেখানে শরয়ি ইলমের কোনো গুরুত্বই অবশিষ্ট থাকেনি। এই ধারায় যারা শিক্ষিত হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে শরয়ি জ্ঞানের তীব্র অভাব। সাধারণত যে কোনো ভ্রান্ত চিন্তাধারা এই শ্রেণির লোকদের মধ্যে বেশি প্রচার পায়। শরয়ি ইলম হল আলোর মতো। এই আলো না থাকলে বিভ্রান্তির অন্ধকার নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

চ) অলসতা ও অবসর

এই পয়েন্টটি অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে! কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অনেক মানুষের ভিতরে এই কারণটি প্রভাব রেখেছে। যারা বিশেষ কোনো ব্যস্ততায় নিজেকে আটকে ফেলে, তারা নিরাপদ; কিন্তু যারা অলস সময় পার করে, যাদের শারীরিক বা মানসিক কোনো ব্যস্ততা নেই—তাদের মনে দেখা দেয় নানা সন্দেহ ও সংশয়। বেশ কিছু মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপকালে এই বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। তাদের কাছে অনেকে ওয়াসওয়াসার সমস্যা নিয়ে আসেন। এদের বড় অংশেরই কোনো ব্যস্ততা নেই। অলস মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে শয়তানের কারখানা! সেখানে জন্ম নেয় নতুন নতুন বিভ্রান্তি ও সংশয়।

৩. সমাধানের পথ খোঁজায় ব্যর্থতা

বেশির ভাগ মানুষ যখন কোনো বিভ্রান্তির মুখোমুখি হয়, তারা এর সমাধান করতে চায় না। যে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ জন্ম নিচ্ছে, ওই বিষয়ে আলেমদের সঙ্গে আলোচনা করতে তাদের আগ্রহ দেখা যায় না। বরং তারা সিদ্ধান্ত নেয়, নতুন যে বিষয়টি সামনে এসেছে, সেটিই সঠিক। অথচ বেশির ভাগ সংশয়গুলোই এমন, যা নিয়ে আলেমদের সঙ্গে আলোচনা করলে তারা সহজে এর সমাধান করে দিতেন। কিন্তু ব্যক্তি নিজের মেধা ও পড়াশোনার উপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ভালো করে যাচাই না করেই একতরফা সিদ্ধান্ত নেন।

প্রতিকার

সমকালীন বিভ্রান্ত চিন্তাধারাকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে একজন দাইকে প্রথমেই নিজের কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করতে হবে। কারণ, ব্যক্তিভেদে বিভ্রান্তির রকমফের থাকে। ফলে সবার ক্ষেত্রে এক ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করা ঠিক নয়। যে অডিয়েন্সে দাওয়াহ পৌঁছানো হবে, তার অবস্থান আগে নির্ণয় করা জরুরি। সমকালীন বিভ্রান্ত চিন্তাধারার মোকাবেলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে তিন ধরনের কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে :

১. বিভ্রান্তিমুক্তদের ক্ষেত্রে কর্মপন্থা
২. বিভ্রান্তিতে পতিতদের ক্ষেত্রে কর্মপন্থা
৩. বিভ্রান্তির প্রচারকদের ক্ষেত্রে কর্মপন্থা

১. বিভ্রান্তিমুক্তদের ক্ষেত্রে কর্মপন্থা

ক) ইসলামি শরিয়ার উসুল মেনে একিনকে দৃঢ় করা

সাধারণ জনগোষ্ঠী যারা এখনও বিভ্রান্তির শিকার হয়নি, কিন্তু সংশয় ও সন্দেহের সামনে নিজেকে টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনাও কম—তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কাজ, একিনকে মজবুত করা। যদি অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়ে যায়, তা হলে নানা সংশয় ও সন্দেহ থেকে অনেকটাই নিরাপদ হয়ে যাবে তারা। যদি অন্তরে ঈমান মজবুত না থাকে, তা হলে যে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ে জড়ানোর গতি হয় দ্রুত।

একিন মজবুত করার জন্য কুরআনুল কারিমের নির্দেশনা অনুসরণ করা জরুরি। কুরআনুল কারিম আমাদের নির্দেশ দেয় আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে। এ বিষয়ে কয়েকটি আয়াত দেখা যাক-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে,) 'পরওয়ারদেগার, এ সব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদেরকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।'[১]

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ব বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?[২]

যারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে না, এক আয়াতে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে—

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।[৩]

সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর কুদরত ও বান্দাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে। জনসাধারণকে কুরআনুল কারিমের তাফসিরপাঠে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের মধ্যে তাদাব্বুরের স্পৃহা

---

১. সুরা আলে ইমরান, ১৯১

২. সুরা ফুসসিলাত, ৫৩

৩. সুরা আম্বিয়া, ৩২

জাগিয়ে তুলতে হবে। এর মাধ্যমে মানুষের মনে একিন সুদৃঢ় হবে এবং যে কোনো ফেতনা ও বিভ্রান্তি থেকে তারা সুরক্ষা পাবে। বাংলা ভাষায় শায়খ আতীক উল্লাহ ইতিমধ্যে কুরআনুল কারিমের তাদাব্বুর ব্যাপক করার কাজটি শুরু করেছেন। আগ্রহী পাঠকরা তার বইপত্র থেকে উপকৃত হতে পারেন।

একিন দৃঢ় করার ক্ষেত্রে আমরা সে সব বইপত্রেরও সাহায্য নিতে পারি, যেখানে ইসলামি শরিয়ার প্রামাণ্যতা ও যৌক্তিকতা আলোচনা করা হয়েছে। সালাফদের যুগ থেকেই এ বিষয়ে অসংখ্য বইপত্র রচিত হয়েছে। বিশেষ করে আরববিশ্বে সমকালীন গবেষকদের অনেকে এ সব বিষয়ে কলম ধরেছেন। তালেবুল ইলমরা এ সব বইপত্র পড়তে পারেন। লেখক-অনুবাদকগণ সাবলীল ভাষায় সহজবোধ্য করে বাঙালি পাঠকের সামনে এ সব লেখা উপস্থাপন করতে পারেন। এ ধরনের কয়েকটি বই :

* *আন-নাবাউল আজিম*—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দরাজ। চমৎকার এই বইতে কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধতার দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। তার লিখিত আরেকটি চমৎকার গ্রন্থ হচ্ছে *আল-মাদখাল ইলাল কুরআন*।

* *বারাহিন ওয়া আদিল্লাতুন ইমানিয়াহ*—আবদুর রহমান হাসান।

* *নবুওয়াতু মুহাম্মদ মিনাশ শাক্কি ইলাল ইয়াকিন*—ফাজেল সামেরি।

* *আল-আদিল্লাতুল আকলিয়াতুন নাকলিয়া আলা উসুলিল ইতিকাদ*—সউদ আরেফি। এই গ্রন্থটি বেশ বড়, আলোচনাও উঁচু মার্গের।

* *কামিলুস সুরাহ*—আহমদ ইউসুফ আস-সাইয়েদ। এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ড বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

নানামুখী সংশয়-নিরসনে বাংলা ভাষায় ইফতেখার সিফাত, শামসুল আরেফীন শক্তি, মাওলানা আফসারুদ্দীন প্রমুখ কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের বইগুলোও আমাদের পড়া উচিত। কয়েকটি বইয়ের তালিকা দেওয়া হল :

* *হিউম্যান বিয়িং*—ইফতেখার সিফাত।
* *ফাহমুস সালাফ*—ইফতেখার সিফাত।
* *সংশয়বাদী*—ড্যানিয়েল হাকিকতজু।
* *ইসলাম প্রতিষ্ঠা*—ইয়াদ কুনাইবি।
* *নারী স্বাধীনতার স্বরূপ*—ইয়াদ কুনাইবি।
* *অবাধ্যতার ইতিহাস*—শামসুল আরেফীন শক্তি।
* *ডাবল স্ট্যান্ডার্ড*—শামসুল আরেফীন শক্তি।

* *ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা*—শামসুল আরেফীন শক্তি।
* *ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড*—মাওলানা আফসারুদ্দীন।
* *ইসলাম ও মুক্তচিন্তা*—মাওলানা আফসারুদ্দীন।

একিন বৃদ্ধির আরেকটি উপায় হল, জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ইলমচর্চায় ব্যস্ত করে ফেলা। মানুষের মনে ইলমের প্রতি ভালোবাসা এবং এর স্বাদ আস্বাদনের আগ্রহ জাগানো। মানুষ নানা অনর্থক কাজে নিজের সময় ব্যয় করে, এই সময় যদি ইলম ও দাওয়াহর পিছনে ব্যয় করে তা হলে কোনো সংশয় বিভ্রান্তি তাদের কাছে আসারই সুযোগ নেই। সালাফদের অনেকেই নিজেদের ইলমি ব্যস্ততা সম্পর্কে বলতেন, আমরা কী নেয়ামত ভোগ করছি তা যদি রাজা-বাদশারা জানত, তা হলে তা কেড়ে নেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। একবার ভাবুন, যাদের অন্তরে এই পরিমাণ তৃপ্তি থাকে, তাদের পক্ষে কি সম্ভব, ইলমের ময়দান ছেড়ে কোনো বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া।[১]

খ) সমালোচক মেধা জাগ্রত করা

মুসলিম প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন তাদের মধ্যে প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। এর ফলে প্রতিটি বিষয়কে তারা যাচাই করবে সমালোচকের দৃষ্টিতে। দলিল ছাড়া কোনো বিষয়কে গ্রহণ করবে না। সঠিক দলিল ও ভুল দলিলের মধ্যে পার্থক্যও করতে পারবে তারা।

সমাজে বেশির ভাগ বিভ্রান্তি ছড়ানোর মূল কারণ—মানুষের মধ্যে ক্রিটিসিজমের সক্ষমতা না থাকা। দলিলশূন্য কথাকেও মানুষ দালিলিক মনে করে গ্রহণ করছে। ভুল-শুদ্ধ যাচাই করতে পারছে না অনেকে। অথচ সালাফে সালেহিন ছিলেন এ সব বিষয়ে সচেষ্ট। তারা সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন—কেউ ইসলামের নামে ভুল কিছু আমদানি করছে কি না! জরাহ-তাদিল শাস্ত্রের ইমামদের কথাই ধরা যাক। কী সূক্ষ্মভাবে তারা মিথ্যুক রাবিদের বর্ণনাকে পৃথক করেছেন বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো থেকে! একেকটি বর্ণনার সমস্যা তারা চিহ্নিত করেছেন নিপুণভাবে। এভাবে তারা হাদিসের বিশাল ভাণ্ডারকে সুরক্ষিত করেছেন।

---

১. আবু সুফিয়ান যখন কাফের অবস্থায় হিরাকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, হিরাকল জিজ্ঞেস করেছিল, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশপাশে যারা আছে, তারা কি তার দ্বীনে প্রবেশের পর তা ত্যাগ করেছে?' আবু সুফিয়ান বললেন, 'না।' হিরাকল জবাব দিয়েছিল, 'এটাই ঈমান।'

নতুন প্রজন্মকে স্বচ্ছ-নির্মল ফিকির ও সুস্থ মন-মানসিকতায় গড়ে তোলার বিকল্প নেই। তাদের মেধা থাকবে জাগ্রত; কোনো চকমকে দাবিতে তারা বিভ্রান্ত হবে না; বরং প্রতিটি বিষয়কে যাচাই করবে মূল উৎস থেকে। বিশ্লেষণী শক্তি ও ক্রিটিসিজম বৃদ্ধি করতে নানা ধরনের সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করা জরুরি। এ সব পদক্ষেপ অবশ্যই বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে হতে হবে। এ সব সেমিনার ও ওয়ার্কশপে শরয়ি ইলম ও দলিলের আলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের উপায় বাতলে দিতে হবে, যেন তরুণ প্রজন্ম বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করার হাতিয়ার পেয়ে যায়।

গ) শরয়ি জ্ঞানের ব্যাপকীকরণ

আকিদা, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, লুগাহ, উলুমুল কুরআন ইত্যাদি শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যাপক করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষিত-মেধাবী লোকজনকে এগুলোর সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে। বিস্তারিত জ্ঞান দান সম্ভব না হলে অন্তত প্রাথমিক জ্ঞানটুকু যেন তাদের থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়টি খুবই জরুরি। কারণ, বিভ্রান্তিগুলো প্রবেশ করে এ সব বিষয়ের কোনো একটির ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে কিংবা অস্বীকার করে।

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য মাদরাসায় ভর্তি হয়ে পাঠগ্রহণ করা সহজ নয়। ফলে এ ক্ষেত্রে বিকল্প বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাদের। প্রয়োজনে অনলাইন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে এ সব শাস্ত্র নিয়ে পাঠদান করা হবে। মসজিদে মসজিদে হালাকাহ-ভিত্তিক পাঠদানের প্রচলন করা যায়। সচেতন আলেমরা ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহার করে ইলমকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। আরবের আলেমদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে এই ধারায় সক্রিয় হয়েছেন। ড. আমের বাহজাতের কথা বলা যায়; তিনি ইউটিউবে বেশ কিছু সিরিজ আলোচনা করেছেন। তার তানবিহুল ফকিহ, আত-তারিক ইলা উসুলিল ফিকহ—এই দুটি সিরিজ বেশ জনপ্রিয়। আহমদ ইউসুফ সাইয়েদও বেশ জনপ্রিয়। তরুণদের নিয়ে তিনি পরিচালনা করছেন একাধিক কোর্স।

ঘ) সর্বসাধারণকে বিভ্রান্তদের রচনাবলি পাঠ থেকে বিরত রাখা

সমকালীন বিভ্রান্ত চিন্তাধারা নিয়ে যারা কাজ করেন এবং যারা তাদের চিন্তার প্রতিটি ফাঁকফোকর সম্পর্কে অবগত—শুধু তারাই এ সব লোকজনের

বইপত্র পাঠ করবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু সাধারণ লোকজনকে এ সব পাঠে উদ্বুদ্ধ করা হবে না; এমনকি তাদের বিরত রাখতে হবে। তারা বিভ্রান্ত চিন্তাধারার খণ্ডনে রচিত বইপত্র পড়বেন। কারণ, সরাসরি বিভ্রান্ত চিন্তাধারার বইপত্র পড়তে গেলে তারা নিজেরাই ওই জালে আটকে যেতে পারেন! আমরা অবশ্যই সর্বসাধারণের ঈমান-আকিদাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারি না। সুতরাং তাদের সামনে এই বিষয়গুলো আলোচনা করে তাদের সতর্ক করতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে অনেকে সরাসরি নাস্তিকদের সঙ্গে বিতর্ক, টকশো করতে যান—যাদের বেশির ভাগের উপযুক্ত শরয়ি ইলম ও নাস্তিকতাবাদ সম্পর্কে ভালো জানাশোনা নেই। এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ! এমন ব্যক্তি হয় নাস্তিকতার ফাঁদে পড়ে যায় অথবা নাস্তিকদের জবাব দিতে গিয়ে শরিয়াকে অপব্যাখ্যা করে। যারা উপযুক্ত জ্ঞান ছাড়া বিভ্রান্তদের রচনাবলি পাঠ করতে যায়, নিজের অজান্তেই তারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। এ জন্যই সালাফগণ বিভ্রান্তদের রচনাবলি পাঠে বারবার সতর্ক করেছেন। তবে সাধারণ মানুষের জন্য বিভ্রান্তদের রদ করে লেখা বইপত্র পাঠের ক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে :

ক. অবশ্যই সেই মতবাদ ও চিন্তাধারা সমসাময়িক হতে হবে। প্রাচীন কিংবা হারিয়ে-যাওয়া চিন্তাধারাপাঠে অযথা সময় নষ্ট হবে।

খ. এমন বইপত্র পড়তে হবে, যেখানে বিভ্রান্ত চিন্তার মূল বক্তব্য এবং এর জবাব দেওয়া হয়েছে। কিছু বই আছে, যেখানে শুধু সমস্যা বলা হয়, সমাধান দেওয়া হয় না। এমন বইপাঠে সাধারণ পাঠকের কোনো উপকার হয় না। বরং সীমিত পরিসরে প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গ. অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বইপত্র খুঁজে নিতে হবে। কিছু বইপত্র থাকে এমন, যেখানে মূল সমস্যাটি না বুঝেই এর কোনো একটি অংশের জবাব দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাঠকের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না। এমন বই পড়তে হবে, যেখানে লেখক প্রতিপক্ষের চিন্তার মৌলিক কাঠামো বুঝতে পেরেছেন এবং তার জবাব দিয়েছেন।

ঙ) দোয়া

বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব—তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখেন, জনসাধারণকে আকিদাগত বিভ্রান্তি থেকে মাহফুজ রাখেন।

কোনো বাতিল চিন্তাধারা ও মতবাদ যেন মুসলিম-সমাজ গ্রহণ না করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের ঈমান-আকিদা স্বচ্ছ ও নির্মল রাখেন। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুতেই আমরা নিজেদের ঈমান-আকিদা টেকাতে সক্ষম নই। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ; এই অনুগ্রহ লাভের জন্য দোয়ার বিকল্প নেই।

২. বিভ্রান্তিতে পতিতদের ক্ষেত্রে কর্মপন্থা

ক) তাদের উপস্থাপিত দলিল পর্যালোচনা করা

প্রতিটি বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা নির্দিষ্ট কয়েকটি ইস্যু নিয়েই সরব থাকে; তাদের সকল বক্তব্য এই কয়েকটি বিষয়েই আবর্তিত হয়। তাদের দ্বারা কেউ প্রভাবিত হলে তার সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে সেই মতবাদের ইস্যুগুলো সামনে রাখতে হবে। তাদের দলিলগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক ও দালিলিক পর্যালোচনা করতে হবে। সাধারণত বাতিল চিন্তাধারা তাদের কাজের ক্ষেত্রে দুই ধরনের দলিল উপস্থাপন করে।

- **প্রথম ধরন:** বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা এমন একটি দলিল দেয়, যার কোনো সত্যতাই নেই।

- **দ্বিতীয় ধরন:** কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, দলিলটি বিশুদ্ধ; কিন্তু দলিল থেকে তারা যে সিদ্ধান্ত আহরণ করেছে, তা ভুল।

প্রথম ধরনের কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক :

ক. অনেকে হজরত মুয়াবিয়া রাজি.-কে গালমন্দ করার জন্য দলিল দেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে গালমন্দ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা যে হাদিসগুলো সামনে আনে, প্রতিটি জাল![১]

খ. আবু হুরায়রা রাজি.-কে অবিশ্বস্ত প্রমাণের জন্য অনেকে বলে থাকে, উমর রাজি. তার উপর চুরির অভিযোগ করেছিলেন। এই বর্ণনাটিও বানোয়াট![২]

গ. অনেকে বলে, হজরত উমর রাজি. একটি সংকলন পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, যেখানে অনেক হাদিস লিপিবদ্ধ ছিল। এই কথা বলে তারা হাদিস অস্বীকারের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায়। অথচ এই বর্ণনাটিও মনগড়া![১]

---

১. *মুসনাদে বাজ্জার*, ৩৮৩৯

২. *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক*, ২০৬৫৯

এগুলো প্রতিটিই এমন দলিল, যা বিশুদ্ধ নয়। এ ক্ষেত্রে দলিলটির মূল অবস্থা বলে দিলেই সমস্যা শেষ।

এবার দেখা যাক, দ্বিতীয় ধরনের দলিলের কিছু নমুনা :

ক. কুরআনিস্টরা দলিল দেয়, আল্লাহ কুরআনুল কারিমে বলেছেন—

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

আমি কোনো কিছু লিখতে ছাড়িনি।[২]

এই আয়াত থেকে তারা দলিল দেয়, কুরআনে আল্লাহ সকল বিষয় বিবৃত করেছেন, ফলে হাদিসের প্রয়োজন নেই। অথচ এখানে কুরআনুল কারিম সম্পর্কে বলা হয়নি, বলা হয়েছে লাওহে মাহফুজ সম্পর্কে! ফলে দলিলটি বিশুদ্ধ হলেও দলিল থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা ভুল।

খ. কুরআনিস্টরা আরেকটি আয়াত সামনে আনে। আল্লাহ বলেছেন—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাজিল করেছি, যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।[৩]

এই আয়াত সামনে এনে তারা বলে, কুরআনে সব কিছু সুস্পষ্ট বিবৃত হয়েছে, তাই হাদিসের দরকার নেই। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, তাদের দলিলটির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল!

গ. হাদিস লিখতে নিষেধ করার কিছু বর্ণনা সামনে এনে তারা প্রমাণের চেষ্টা চালায় যে, হাদিস সংকলিত হোক, তা খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই চাননি। এ ক্ষেত্রেও তারা দলিলের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়।

খ) প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া

যারা বিভ্রান্ত চিন্তাধারায় নিপতিত হয়েছে, তাদেরকে প্রশ্ন করার এবং নিজের মানসিক অবস্থান জানানোর সুযোগ দিতে হবে। তাদের সঙ্গে

---

১. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৬১৭০

২. সুরা আনআম, ৩৮

৩. সুরা নাহাল, ৮৯

আলোচনা হলেই বিভ্রান্তির মূল বিষয়গুলো ধরা পড়বে। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যার-তার সামনে তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে না। যদি তারা এমন কাউকে প্রশ্ন করে, যিনি সমাজে দ্বীনদার হিসাবে পরিচিত, কিন্তু আকিদা সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা নেই কিংবা সমকালীন বিভ্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না—তা হলে তিনি এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। আহলে বাতিল একে আহলে হকের পরাজয় হিসাবে প্রচার করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করবে। সুতরাং বিভ্রান্ত চিন্তাধারার লোকজনের সঙ্গে অবশ্যই যোগ্য আলেমরা আলোচনা করবেন। তাদের মজলিসে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে এবং তারা উত্তর দেবেন। পুরো বিষয়টি সম্পন্ন হবে কুরআনুল কারিমের এই নির্দেশনাকে সামনে রেখে—

فَاسْأَلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমাদের জানা না থাকে।[১]

গ) পূর্ববর্তী আলেমদের লেখা থেকে সাহায্য নেওয়া

মানাজির আহসান গিলানি একটা চমৎকার কথা বলেছেন। তার মতে, পৃথিবীতে কোনো মতবাদই নতুন নয়; মতবাদগুলো সাধারণত পূর্বের নানা মতবাদের শাখা-প্রশাখার সংমিশ্রণে নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করে! শায়খ গিলানির কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। আমাদের সামনে উপস্থিত প্রতিটি বাতিল চিন্তাধারাই পূর্বের মতবাদগুলো থেকে কিছু-না-কিছু গ্রহণ করেছে। কিছু প্রশ্ন এমনও আছে, যা হাজার বছর ধরে বারবার উপস্থাপিত হচ্ছে আর আলেমরা জবাব দিচ্ছেন। তাকদির-সংক্রান্ত যে সব সংশয় ছড়ানো হয়, এর কোনোটিই নতুন নয়, বরং আগ থেকে চলে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মন্দ ও ইবলিস সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন করা হয়, এর সবই পুরনো। অমুসলিমদের শিশু সন্তানদের স্থান কোথায় হবে—এ নিয়ে যে সব প্রশ্ন, তাও নতুন নয়।

এ সব ক্ষেত্রে আমাদের উচিত পূর্ববর্তী আলেমদের রচনাবলি থেকে সাহায্য নেওয়া। যদি প্রশ্ন হুবহু আগের রূপে আসে, তা হলে তো সেই জবাবটি উপস্থাপন করলেই চলে। যদি প্রশ্ন কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আসে কিন্তু

---

১. সুরা নাহাল, ৪৩

মৌলিক কাঠামো একই থাকে, তা হলে আলেমদের লেখা থেকে মূল রসদ নিয়ে নতুন উপস্থাপনায় জবাব দিতে হবে। সালাফদের ইলমের সঙ্গে আমাদের সংযুক্তি প্রতিষ্ঠা হলে তাহরিফ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে। অনেকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে জবাব দিতে যান, যার ফলে বিভ্রান্তি প্রতিহত করতে গিয়ে তিনি নতুন বিভ্রান্তি জন্ম দেন। তবে মনে রাখতে হবে, কাজটি সহজ নয়! এর জন্য চাই ব্যাপক অধ্যয়ন ও নিমগ্নতা।

ঘ) সুস্পষ্টের সাহায্যে অস্পষ্টের ব্যাখ্যাদান

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সুরা আলে ইমরানের একটি আয়াত দেখা যাক। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন—

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা ফেতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর অনুসরণ করে। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন, 'আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।' আর বোধশক্তিসম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।[১]

এই আয়াত থেকে জানা যায়, কুরআনুল কারিমের সকল আয়াত এক ধরনের নয়। কিছু আয়াত আছে সুস্পষ্ট, যার অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে কোনো জটিলতা নেই। এ ধরনের আয়াতকে মুহকাম বলে। অপর দিকে কিছু আয়াত আছে অস্পষ্ট, যার মূল মর্ম উপলব্ধি করা সহজ নয়। এ ধরনের আয়াতকে মুতাশাবিহ বলে। ইমাম ইবনে কাসির এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'যে

---

১. সুরা আলে ইমরান, ৭

ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতকে প্রথম প্রকারের আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়—অর্থাৎ যে সমস্যার সমাধান যেই আয়াতে পায়, সেখান থেকেই গ্রহণ করে, সে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান পায়। অপর দিকে যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট আয়াত ত্যাগ করে অস্পষ্ট আয়াতগুলো নিয়েই ব্যস্ত হয়, সে আরও বেশি সমস্যায় আটকে যায়।'[১]

বাতিল চিন্তাধারা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই কুরআনি নির্দেশনা সামনে রাখতে হবে। যদি তারা আয়াতে মুতাশাবিহ সামনে আনে, তা হলে মুহকাম আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে। যদি কোনো খ্রিষ্টান বা ভিন্নধর্মী এসে বলে, একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব কুরআন থেকেই প্রমাণিত; যেমন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[২]

এই আয়াতে আল্লাহর ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে—তা হলে একাধিক স্রষ্টা মেনে নিতে সমস্যা কোথায়? এ ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের বলা হবে, এই ধরনের সর্বনামগুলো যেভাবে বহুবচনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তেমনি সম্মানসূচকও ব্যবহার হয়। সম্মানিত ও প্রভাবশালীরা সাধারণত নিজের বক্তব্যকে বহুবচনের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলেন। এরপর আমরা তাদের সামনে মুহকাম আয়াত উপস্থাপন করব, যেখানে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।[৩]

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক। এ কথা পরিহার করো। তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য।[৪]

---

১. *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ২/২৫৩
২. সুরা হিজর, ৯
৩. সুরা ইখলাস, ১
৪. সুরা নিসা, ১৭১

যদি এভাবে মুতাশাবিহাত থেকে মুহকামের দিকে আলোচনা ঘুরানো হয়, তা হলে তাদের উপস্থাপিত বেশির ভাগ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

ঙ) প্রশ্নকারীকেই জটিলতায় ফেলা

আলোচনার ক্ষেত্রে শুধু ইতিবাচক জবাবদানই যথেষ্ট নয়। কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত লোকদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করে আটকে ফেলতে হবে! তাদের অবস্থান দিয়েই তাদেরকে আঘাত করা হলে অনেক ক্ষেত্রে তারা চুপসে যায়। যেমন, জুলুম-অন্যায় সম্পর্কে তারা নানা প্রশ্ন করে থাকে। এর মধ্যে একটি হল, জালেম কোনো শাস্তি ছাড়াই পার পেয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের ইস্যুতে মুমিনদের তো চিন্তার কিছু নেই! কারণ, মুমিন বিশ্বাস করে—জালেমের কোনো ছাড় নেই, দুনিয়াতে বেঁচে গেলেও আখেরাতে তাকে শাস্তি পেতেই হবে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত ব্যক্তিকেই পাল্টা প্রশ্ন করে আটকে ফেলা যায়! তাকে জিজ্ঞেস করা যায়—যেহেতু আখেরাতেই তার অবিশ্বাস, তা হলে এমন জুলুমের বিষয়ে তার অবস্থান কী? জালেম কি শাস্তি পাবে, নাকি সে নিজের সকল জুলুম নিজের সঙ্গে কবরে নিয়ে গেছে?

কুরআনিস্টরা বলে আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। তাদেরকে বলা হবে—এই দেখো, কুরআনেই বলা আছে, নবীজির আনুগত্য করতে, বিধিনিষেধ মেনে নিতে, তিনি নিজ থেকে কিছুই বলেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন কুরআন মানলে তোমাকে হাদিসও মানতে হবে। এই আলোচনা করলেই শুরু হবে তাদের অস্বস্তি! কারণ, এ বিষয়ে তাদের কাছে স্পষ্ট কোনো জবাব নেই।

চ) সংশয় ও ওয়াসওয়াসা পৃথক করা

মানুষের নফস খুবই রহস্যময়। একেক সময় এখানে একেক ভাবনা খেলা করে। মুহূর্তের অসতর্কতায় নেককার ব্যক্তিকে নফস পাপে লিপ্ত করে ফেলে। নফস মানুষকে নানা ধোঁকা দেয়। ওয়াসওয়াসা দেয়। এ থেকে কেউই নিরাপদ নয়। সালাফে সালেহিনের ক্ষেত্রেও এগুলো ঘটেছে। কিন্তু তারা নফসের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। এ সব সমস্যার সমাধান জানতেন। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা থাকতেন নিরাপদ।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই মূল সমস্যা হল ওয়াসওয়াসা। তার মধ্যে দ্বীন বা ঈমান নিয়ে সংশয় নেই, কিন্তু ওয়াসওয়াসা আছে। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে অবশ্যই ভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। সংশয়বাদীর ক্ষেত্রে অবলম্বন-করা কর্মপন্থা এখানে প্রয়োগ করা যাবে না।

সংশয় ও ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রে মৌলিক তফাত হল—সংশয় সাধারণত নির্ধারিত কিছু প্রশ্ন ঘিরেই আবর্তিত হয়; সে সব প্রশ্নের জবাব দিলে ব্যক্তি শান্ত হয়ে যায় অথবা নিজের অবস্থানে থাকে। কিন্তু ওয়াসওয়াসার বিষয়টি এমন নয়; তাকে এক প্রশ্নের জবাব দিলে আরও হাজার প্রশ্ন করে! অনেক সময় এক প্রশ্নের হাজারবার জবাব দিলেও সে একই প্রশ্ন করতে থাকে! আলোচনা বারবার একই কথায় ঘুরতে থাকে!

ওয়াসওয়াসা-আক্রান্ত ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব দিয়ে আসলে লাভ নেই। কারণ, এখানে উত্তর দেওয়াটা সমাধান নয়, বরং ওয়াসওয়াসা দূর করা সমাধান। এ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে ওয়াসওয়াসার সমাধান বাতলে দিতে হবে। যেমন একটি সমাধান হল, বেশি বেশি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়া। এটি পড়লে ওয়াসওয়াসার সমস্যা এমনিই কেটে যায়। দ্বিতীয়ত, এই ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে না। সে যা-ই বলুক, উত্তর দেওয়া যাবে না। তার সঙ্গে ঈমান-আমলের স্বাভাবিক আলাপ করতে হবে এবং নেককারদের সোহবতে পাঠানো হবে। সোহবতের প্রভাবে এই সমস্যা কেটে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা যে কয়টি কর্মপন্থা আলোচনা করলাম, তা মেনে চললে বেশির ভাগ সংশয় ও সন্দেহের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু জবাবদানই শেষ কথা নয়, হেদায়েত তো আল্লাহর হাতে! ফলে দেখা যাবে, সব কায়দা মেনে চললেও সংশয় দূর হচ্ছে না, ব্যক্তি হেদায়েতের পথে আসছে না। এ ক্ষেত্রে তার জন্য আল্লাহর কাছে বারবার দোয়া করার বিকল্প নেই। আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব এবং সাফল্যের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইব।

৩. বিভ্রান্তির প্রচারকদের ক্ষেত্রে কর্মপন্থা

ক) সঠিক প্রস্তুতি

বাতিল মতবাদের প্রচারকদের সঙ্গে আলোচনার পূর্বশর্ত হল, সঠিক প্রস্তুতি নিতে হবে। তাদের চিন্তাধারার মূল বক্তব্য, তাদের ধোঁকা, তাদের প্রকৃত অবস্থান—এই বিষয়গুলো স্পষ্ট থাকতে হবে। এই প্রস্তুতি না থাকলে আলোচনায় তাদের সামনে টেকা মুশকিল। তাদের বিভ্রান্তি ও সংশয়গুলো সম্পর্কে সঠিক জানাশোনা থাকলে খুব অল্প সময়েই তাদের জবাব দেওয়া সম্ভব। অন্যথায় হকের ঝাণ্ডাবাহী ব্যক্তিও তাদের সামনে পরাস্ত হতে পারেন। মনে রাখবেন, প্রস্তুতিবিহীন ইখলাস দিয়ে বাতিল মতাবলম্বীর জবাব দেওয়া যায় না। জবাব দিতে চাই বিস্তৃত পড়াশোনা ও সঠিক প্রস্তুতি।

খ) আলোচনার শুরুতে মূলনীতি নির্ধারণ করা

আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন কিছু বিষয় নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে দুই পক্ষ একমত। সেই উসুল সামনে রেখে আলোচনা এগুতে হবে। যদি এই উসুল নির্ধারণ করা না হয়, তা হলে অযথা সময়ক্ষেপণ হবে, আলোচনা হবে এলোপাথাড়ি। যেমন, কুরআনিস্টদের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে বলা হবে— তোমরা শুধু কুরআন মানো, আর আমরা কুরআন-হাদিস উভয়টি মানি। যেহেতু কুরআনের বিষয় দু দলই একমত, সুতরাং আমরা কুরআনের সাহায্যে হাদিসের প্রামাণ্যতা প্রমাণ করব। তোমরা কুরআন মানো, তাই হাদিস সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশও মানতে বাধ্য।

মামাতি[১] ফেরকার সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে বলা হবে—তোমরা নিজেদের দেওবন্দি বল, আমরাও নিজেদের দেওবন্দি বলি। যেহেতু এই বিষয়ে দুই দলই একমত, তাই হাদিস-কুরআনের দলিল না দিয়ে আকাবিরে দেওবন্দের লেখা থেকে দলিল দেওয়া হোক। যাদের অবস্থান আকাবিরে দেওবন্দের সঙ্গে মিলবে, তারা প্রকৃত দেওবন্দি। এই উসুল মেনে চললে অল্প সময়ে আলোচনার মূল পয়েন্টে যাওয়া যাবে।

গ) আলোচনার মূল বিষয় নির্ধারণ করা

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, আসলে দুই পক্ষ একই মত লালন করছে, শুধু উপস্থাপনার ভুলের কারণে একে-অপরকে প্রতিপক্ষ ভাবছে। সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে এ ধরনের বিতর্ক প্রচুর দেখা যায়। এ জন্য আলোচনার পূর্বে মূল বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। উপস্থাপনের ভিন্নতা বাদ দিয়ে প্রকৃত বক্তব্য ও অবস্থান তালাশ করতে হবে।

কিছু মানুষকে দেখা যায়, একটি বিষয় ভালো করে না বুঝেই আলোচনা শুরু করে দেন। এমন জায়গায় তিনি শ্রম বিতরণ করতে থাকেন, যেটার আসলে দরকারই ছিল না।

ঘ) প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

বাতিল-মতাবলম্বীরা আলোচনার ক্ষেত্রে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তাদের কিছু বক্তব্য এমন থাকে, প্রথম দেখায় যাকে মনে হয় আহলুস সুন্নাহর

১. মামাতি হচ্ছে এক ফেরকা, যারা মনে করে নবীজি রওজায় হায়াতে নেই, তিনি হায়াতুন্নবী নন। অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা হল, রাসুল হায়াতুন্নবী।

অবস্থান। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হয় যে, এর পিছনে আছে কুফর ও ইলহাদ। এ জন্য তাদের বক্তব্যের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও যাচাই জরুরি। ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণে অনেক সময় বক্তব্যের মূল রূপটি ধরা যায় না। মুসলিম বিতার্কিক ও আলোচকদের অনেকে এখানে এসে হোঁচট খান।

ঙ) প্রতিরক্ষা নয়, আক্রমণও জরুরি

আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটি ভুল হল, বেশির ভাগ সময় আমরা শুধু সংশয়ের জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হই। বিভ্রান্ত মতবাদের সাধারণ অনুসারীর ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হলেও মতবাদের প্রচারকদের ক্ষেত্রে এ অবস্থান নেওয়া উচিত নয়। তাদেরকে জবাবদানের পাশাপাশি পাল্টা আক্রমণ করতে হবে। তাদের যুক্তির অসারতা, তথ্যের বিকৃতি, চিন্তার দুর্বলতা—এ সব তুলে জোরদার প্রশ্ন ছুড়ে দিতে হবে তাদের সামনে, যেন তারা নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং নতুন প্রশ্ন তোলার পরিবর্তে জবাব দিতেই ব্যস্ত থাকে।

চ) উত্তরের ফলাফল বিবেচনা করে মুখ খোলা

বাতিল মতাবলম্বীরা আলোচনায় নানা কৌশলের আশ্রয় নেয়। এ সব ক্ষেত্রে তাদের মতলব বুঝে সামনে এগোতে হবে। বাহ্যিকভাবে সরল মনে হলেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না, বরং বিবেচনা করতে হবে এর ফলাফল কী দাঁড়ায়। যেমন, নাস্তিকরা প্রশ্ন করে, প্রত্যেক সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। বিষয়টি তো সত্য। এখন আপনি যদি জবাব দেন, হ্যাঁ, সে প্রশ্ন করবে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এ জন্য এ ক্ষেত্রে উত্তর দিতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। তার প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বা না—না বলে বলতে হবে, আল্লাহ কোনো সৃষ্ট নন, ফলে তাকে কে সৃষ্টি করেছে সেই প্রশ্নই অবান্তর।

ছ) দাবি করলে দলিল, উদ্ধৃত করলে সঠিক সূত্র

আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় সামনে রাখতে হবে। যদি কেউ কোনো বিষয় দাবি করে, তা হলে তাকে এর পক্ষে দলিল দিতে বলা হবে। দলিল ছাড়া নিছক মুখের কথা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যাবে না। আর যদি সে অপর কারও বক্তব্য উদ্ধৃত করে, তা হলে সঠিক সূত্র ও রেফারেন্স উপস্থাপন করতে হবে। সূত্র মিলিয়ে দেখা হবে, সে সঠিক বলছে কি না। এই দুইটি বিষয় যদি ঠিক না থাকে, তা হলে আলোচনা করা বৃথা।

জ. দলিলের সামগ্রিক পর্যালোচনা

বাতিল-মতাবলম্বীরা সাধারণত এক-দুইটি নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদিস সামনে এনে নিজেদের দাবি প্রমাণের চেষ্টা চালায়। ফলে আলোচনার সময় ওই বিষয়ক সকল নুসুস সামনে রেখে তাদের জবাব দিতে হবে। শুধু ওই এক-দুটি নুসুসের ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া যাবে না। যেমন, ইহুদিরা কুরআনের একটি আয়াত সামনে আনে—

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا

তুমি বলে দাও, 'তোমরা তাওরাত নিয়ে এসে তা পাঠ করো।'[১]

এই আয়াত এনে তারা নিজেদের ধর্মমতের বৈধতা দিতে চায়। অথচ তাদের বক্তব্যের সত্যায়ন করে না এই আয়াত। কুরআনে অন্য বহু আয়াত আছে, যেখানে স্পষ্টভাবে ইহুদি-নাসারাদের ধর্মমতকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে আমাদেরকে ওই আয়াতগুলো উপস্থাপন করতে হবে।

বাতিল চিন্তাধারা প্রতিহত করা কেন জরুরি?

বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রতিহত করতে গেলেই অনেকে তেড়ে আসেন। তাদের মতে এ সব তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ফেতনা উস্কে দেওয়া হয়। অথচ বাস্তবতা হল, বাতিল চিন্তাধারাকে প্রতিহত না করাই ফেতনার মূল কারণ। বাতিল চিন্তাধারাকে প্রতিরোধ করা ইসলামের গুরুতপূর্ণ একটি আমল। বাতিল চিন্তাধারা প্রতিহত করার কিছু গুরুত্ব তুলে ধরা হল।

১। নবী রাসুলদের কাজ ছিল হক প্রচার করা এবং বাতিল মতবাদের গোঁড়ায় আঘাত করে মানুষের ঈমান-আকিদা মজবুত করা। নবীদের ওয়ারিস আলেমদের সামনেও এই দায়িত্ব চলে আসে, যা এড়ানোর সুযোগ নেই।

২। সুরা ফুরকানের ৫২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, কুরআনের মাধ্যমে কঠোর সংগ্রাম করার। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'যে ব্যক্তি বেদআতিদের প্রতিহত করেন তিনি মুজাহিদ।' ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বলেন, 'সুন্নাহকে রক্ষা করা জিহাদের চেয়েও উত্তম।'[২]

---

১. সুরা আলে ইমরান, ৯৩

২. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ৪/১৪

সমকালীন ভ্রান্ত চিন্তাধারার সামগ্রিক চিত্র

প্রতিটি যুগের মতো এ যুগেও সমাজে বিরাজ করছে নানা বাতিল চিন্তাধারা ও মতবাদ। মুখরোচক শব্দ ও বাক্যে তারা প্রচার করছে নিজেদের মতবাদ। তাদের পাশে আছে বুদ্ধিজীবি-সমাজ ও মিডিয়া। পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমেই তারা প্রচার করছে নিজেদের চিন্তাধারা। তাদেরকে রদ করতে হলে তাদের সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা থাকা চাই। এই লেখায় ভ্রান্ত চিন্তাধারার একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমকালীন সকল ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রধানত দুই ধারায় কাজ করে। প্রতিটি ধারা আবার একাধিক শাখায় বিভক্ত। সংক্ষেপে প্রতিটি ধারার আলোচনা করছি।

১. ইসলামের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে সংশয়। এটি চার ভাগে বিভক্ত। যথা :

ক) আল্লাহর অস্তিত্ব, হিকমাহ ও কর্ম সম্পর্কে সংশয়। এর আছে দুটি শাখা। যথা :

* আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়। যেমন, এতে প্রশ্ন করা হয়— আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?

* আল্লাহর হিকমাহ ও কামাল সম্পর্কে সংশয়। যেমন, এতে প্রশ্ন করা হয়— আল্লাহ কেন আমাদের ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন? কেন সাময়িক অপরাধের জন্য অনন্ত কাল শাস্তি দেবেন?

খ) কুরআনুল কারিম সম্পর্কে সংশয়। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা :

* কুরআনুল কারিম যে আল্লাহর বাণী, এ সম্পর্কেই সংশয় ও প্রশ্ন তোলা হয়।

* কুরআনুল কারিমের কিছু ভুল ধরার চেষ্টা করা হয়। শব্দগত, মর্মগতত ও একাধিক আয়াতের পারস্পরিক পার্থক্যগত।

গ) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত সংশয়। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা :

* নবীজির নবুওত সম্পর্কিত সংশয়। নানা মিথ্যা অভিযোগ তুলে নবুওত অস্বীকার করা হয়।

* নবীজির জীবনের কিছু সিদ্ধান্ত ও অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। যেমন: আয়েশা রাজি.-এর বিবাহ-সংক্রান্ত, একাধিক স্ত্রী সম্পর্কিত, বনু কুরাইজার ঘটনা ইত্যাদি।

ঘ) ইসলামি শরিয়া সম্পর্কিত সংশয়। এতে ইসলামি শরিয়ার একাধিক বিধান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। যেমন বলা হয়: ইসলামে মহিলাদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে; ইসলামের জিহাদ বিধান অমানবিক; মুরতাদের শাস্তি দেওয়া অনৈতিক; চোরের হাত কাটা কিংবা জিনাকারী বা কারিনীকে হত্যা করা ইত্যাদি জুলুম।

২. ইসলামের শাখাগত বিভিন্ন বিষয়ে বিভ্রান্তি ও সংশয়। এটি চার ধারায় বিভক্ত। যথা :

ক) হাদিস সম্পর্কিত সংশয়। এর রয়েছে একাধিক ধারা। যেমন :

* হাদিসের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। বলা হয়, হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

* আহাদ হাদিসগুলো নিয়ে সংশয়।

* রাবিদের উপর আপত্তি ও সংশয়।

* হাদিস সংকলনের ইতিহাস নিয়ে সংশয়।

* ইলমুল হাদিস ও মুহাদ্দিসদের মানহাজ নিয়ে সংশয়।

* আকলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হাদিসগুলো নিয়ে সংশয়।

খ) নুসুসে শরিয়া বোঝার মানহাজ-সংক্রান্ত সংশয়। এ ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিনের অবস্থান ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা চালু করার চেষ্টা চালানো হয়।

গ) সাহাবিদের ব্যাপারে সংশয়। ইতিহাসের নানা দুর্বল ও অপ্রমাণিত বর্ণনা টেনে সাহাবিদের দোষারোপ করার চেষ্টা করা হয়।

ঘ) ইসলামের ফৌজদারি বিধান সম্পর্কিত সংশয়।[১]

---

১. এখানে সকল সংশয় ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা আসেনি; তবে বেশির ভাগের মৌলিক কাঠামো চলে এসেছে। ঘুরেফিরে এগুলোই নানা রূপে, নানা বর্ণে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়।

সংশয় নিরসন

আলোচ্য প্রতিটি ধারার নির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য আছে। সংশয় ছড়ানোর ক্ষেত্রে ঘুরেফিরে বারবার এই বক্তব্যগুলোই তারা উপস্থাপন করে। নিম্নে তাদের এই বক্তব্যগুলো খণ্ডন করা হল। এখানে শুধু সংক্ষেপে মৌলিক কথা বলা হচ্ছে, কেউ এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে সহায়ক গ্রন্থাদি পড়ে নেবেন।

১. ইসলামের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে সংশয়

ক. আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত সংশয়

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন নানা সংশয় ছড়ানো হয়। এগুলোর জবাবের পূর্বে কিছু মৌলিক আলোচনা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি মৌলিক তিনটি অবস্থানের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়।

প্রথমত, প্রতিটি মানুষ নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষা নিয়েই বেড়ে ওঠে। এই শিক্ষাগুলো নানা অভিজ্ঞতার সমষ্টি, যা কোনো স্কুল-কলেজে পাঠ্য নয়; কিন্তু জন্মের পর নানা ঘটনাবলির মধ্যে বেড়ে-ওঠা মানুষ তা অর্জন করে। এ ধরনের একটি অভিজ্ঞতা হল, প্রত্যেক সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। মানুষ যা-ই দেখুক, সে বুঝতে পারে—এর পিছনে একজন কারিগর আছেন, যিনি তা তৈরি করেছেন। এ ধরনের আরেকটি সূত্র হল—কোনো কিছুর অংশ তার পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর চেয়ে ছোট। এই সূত্রগুলো খাটিয়ে দুইভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়।

ক. প্রথমত, এই সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যায়, অবশ্যই এর কোনো সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি একে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এত বিশাল মহাজগৎ কারও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আপনা-আপনি চলতে পারে না! মহাবিশ্বকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের রব—আল্লাহ তায়ালা।

খ. প্রত্যেক মানুষের ভিতর কমন কিছু গুণাগুণ থাকে, যা তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সে নিজে অর্জন করেনি কিংবা এ সম্পর্কে তার কোনো সচেতনতাও ছিল না। বাইরের কোনো সত্তা মানুষের মধ্যে এই সব গুণাবলি সঞ্চার করেছেন। ফলে এই গুণাবলিই প্রমাণ করে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের মনোবৃত্তির স্বাভাবিক চাহিদা হল, সে একজন উপাস্য চায়। এটা মানুষের ফিতরত, যাকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। মানুষ সব

সময় চায়, নিজের চেয়ে শক্তিশালী কোনো সত্তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে আশ্রয় পেতে। এ জন্য মানুষের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, হয় তারা নবী-রাসুলের দাওয়াত গ্রহণ করেছে অথবা নিজেদের মতো কোনো দেব-দেবী বানিয়ে তার উপাসনা করেছে। এমনকি তারা চাঁদ, সূর্য, তারা ও গাছগাছালির পূজা করেছে। মানুষ কখনও প্রকৃত স্রষ্টাকে খুঁজে নেয়, আবার কখনও ভুল জায়গায় স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু প্রতিটি মানুষই অন্তর থেকে স্রষ্টাকে লালন করে। অনেক নাস্তিকও এ জন্য বিপদে পড়লে দ্রুত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে ফিরে আসে! এ জন্যই নবী-রাসুলগণ দুনিয়াতে আসার পর আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ নিয়ে বেশি আলোচনা করেননি। কারণ, এ বিষয়ে মানুষ আগ থেকেই একমত ছিল। নবীগণ বেশি আলোচনা করেছেন আল্লাহর তাওহিদ নিয়ে, আল্লাহ ব্যতীত সকল গাইরুল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা নিয়ে। নবীজি সা. নিজেও হাদিসে বলেছেন, 'প্রত্যেক শিশু ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা তাকে খ্রিষ্টান বানায় বা ইহুদি বানায় অথবা মূর্তিপূজারি বানায়।'[১]

হাদিসে যেই ফিতরতের কথা বলা হয়েছে, এটিই মানুষকে আল্লাহর দিকে পথনির্দেশ করে। এক স্রষ্টাকে খুঁজতে ভাবায়, যদি পরিবেশের কারণে তা নষ্ট না হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'মানুষের স্বাভাবিত ফিতরত হল, স্রষ্টার পরিচয় লাভ করা। যদি কারও ফিতরত নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে সে তা অর্জন করতে পারে না।' মানুষের ফিতরতের স্বাভাবিক গতি ও চাহিদা থেকেও বোঝা যায়, এই মহাজগতের একজন প্রতিপালক আছেন।

তৃতীয়ত, মানুষ ও প্রাণিজগতের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু নিয়ম লক্ষ করা যায় যে, কিছু বিষয় সে শিক্ষা ছাড়াই অর্জন করতে পারে। একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন কেউ তাকে দুধ পানের নিয়ম শেখায় না; কিন্তু সে নিজ থেকেই তা সম্পন্ন করতে পারে। বস্তুবাদীরা বলবে, এটি তার স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় তাকে শিখিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, এই ইন্দ্রিয়গুলো পরিচালনা করছেন কে?

১. আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?

নাস্তিক্যবাদীদের একটি বড় প্রশ্ন হল, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? তাদের এই প্রশ্নের পিছনে যে চিন্তা থাকে, সেটিই ভুল। যদি কাউকে প্রশ্ন করা

---

১. *বুখারি*, ১৩৮৫

হয়, 'পুরুষদের গর্ভের মেয়াদও কি মহিলাদের মতো নয় মাস'—এই প্রশ্ন যেমন ভুল, 'আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে', সেই প্রশ্নও এমন ভুল। আল্লাহ সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্ন করারই সুযোগ নেই। কে সৃষ্টি করেছে, এই প্রশ্ন করা যায় মাখলুকের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তো মাখলুক নন, তিনি নিজেই খালেক। তা হলে তার ক্ষেত্রে কী করে এই প্রশ্ন ওঠে?

তাদের এই প্রশ্ন মেনে নিলে খালেক ও মাখলুক সমান হয়ে যায়। যদি খালেক সম্পর্কেও মাখলুকের ন্যায় প্রশ্ন তোলা হয়, তা হলে তো প্রশ্নের শেষ হবে না কোনো দিন! এরপর প্রশ্ন উঠবে—আল্লাহকে যে সৃষ্টি করেছে, তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এরপরের জনকে কে সৃষ্টি করেছে? খালেকেরও একজন সৃষ্টিকর্তা থাকবেন—এই অনুমান মেনে নিলে শুরু হয় অনন্ত প্রশ্নের সিলসিলা, যা কখনওই থামবে না! মডার্ন ফিলোসফিতে এই বিস্ময়কে 'ইনফিনিট রিগ্রেস' নামে অভিহিত করা হয়। দার্শনিকরাও স্বীকার করেন, ইনফিনিট রিগ্রেস কোনো যৌক্তিক অবস্থান নয়। বরং একে ব্যবহার করা হয় লজিক্যাল ফ্যালাসি বা কুতর্কের ক্ষেত্রে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন রাসুল পাঠিয়ে, যিনি স্পষ্ট করে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ আপনিই প্রথম, আপনার আগে আর কিছু নেই।'[১] নাস্তিকদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাব কী হবে, এ বিষয়েও নবীজি নির্দেশনা দিয়েছেন। নবীজি সা. বলেছেন, 'তোমাদের কারও কাছে শয়তান এসে প্রশ্ন করতে পারে—এটি কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে! এভাবে প্রশ্ন করতে করতে শেষে সে প্রশ্ন করবে—তোমাদের রবকে কে সৃষ্টি করেছে! তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বিরত থাকে।'[২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, 'বান্দা যখন একদম সমাপ্তিতে পৌঁছে যায়—তখন তার উপর আবশ্যক হল, সে থেমে যাবে। এরপর তাকে নতুন কিছু জিজ্ঞেস করা হলেও সে চুপ থাকবে।'

নাস্তিকদের আলোচনায় এক প্রকার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দেখা যায়। প্রথমত, তারা বিশ্বাস করে—এই মহাজগৎ কেউ সৃষ্টি করেনি, নিজে নিজেই অস্তিত্ব পেয়েছে। কিন্তু যখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আলোচনা হয়, তখন তারা

---

১. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ১৬/১৮৯

২. *বুখারি*, ৩২৭৬

ধরে নেয়—আল্লাহর একজন সৃষ্টিকর্তা থাকা আবশ্যক! অথচ সৃষ্টিকর্তা থাকা প্রয়োজন এই মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে, আল্লাহ তো নিজেই খালেক! তার কোনো সৃষ্টিকর্তা কেন থাকবে? তিনি তো সৃষ্ট নন!

এই বিষয়ে সামি আমেরি *ফামান খলাকাল্লাহ* নামে একটি চমৎকার বই রচনা করেছেন। ইতিমধ্যে এটি বোদ্ধামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যারা এই বিষয়ে কাজ করবেন, তারা বইটির সাহায্য নিতে পারেন।

২. মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি করেছে

নাস্তিকদের দাবি, মহাবিশ্বের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। মহাবিশ্ব টিকে আছে প্রাকৃতিক নিয়মে। মহাবিশ্ব নিজেই কিছু নিয়ম সৃষ্টি করেছে এবং সে নিয়ম অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করছে। তাদের এই দাবি হাস্যকর। যদি কেউ বলে, মোটর সাইকেলের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, বরং মোটর সাইকেল নিজেই কিছু নিয়ম তৈরি করে, সেই নিয়ম অনুসারে নিজেকে সৃষ্টি করেছে— এটি যেমন উদ্ভট শোনাবে, নাস্তিকদের দাবিটিও তেমন। কেউ কি বলবে, বিদ্যুৎকেন্দ্র নিজেই কিছু নিয়মের মাধ্যমে বিদ্যুৎকেন্দ্র সৃষ্টি ও পরিচালনা করছে!

স্বাভাবিক চিন্তা থেকেই নাস্তিকদের দাবির অসারতা প্রমাণ হয়। পৃথিবীতে কোনো কিছুই নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এ সবের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তা হলে প্রশ্ন ওঠে—সেই সৃষ্টিকর্তা কে?

আল্লাহর হিকমাহ সম্পর্কিত সংশয়

এ সংক্রান্ত আলোচনায় বেশ কিছু প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসে। যেমন: আল্লাহ কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন? কেন ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন? কেন পৃথিবীতে মন্দ বিষয় সৃষ্টি করা হয়েছে? কেনই বা তা করলে আবার শাস্তি দেওয়া হবে? কেন মানুষের দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়? এমনকি অনেকের দোয়া কেন কবুলই হয় না? এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা পিছনে গিয়েছে। এখানে তাই পুনরুল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

খ. কুরআনুল কারিম-কেন্দ্রিক সংশয়

কুরআনুল কারিম-কেন্দ্রিক যে সকল সংশয় প্রকাশ করা হয়, এর প্রথমটি হল—কুরআন কি সত্যি আল্লাহর কালাম? নাকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মতো করে এটি তৈরি করে আল্লাহর নামে প্রচার

করেছেন? নাউজুবিল্লাহ! এই আলোচনাটি মূলত নবীজির ব্যক্তিসত্তার উপর নির্ভর করে। নবীজির সততা, আমানতদারিতা যদি কারও সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তা হলে তার মাথায় এই প্রশ্ন আসার সুযোগ থাকে না। সামনে নবীজির বিষয়ে যে সব প্রশ্ন তোলা হয়, সেগুলোর জবাব দেওয়া হবে। আশা করি, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

কুরআনুল কারিমের উপর বড় আরেকটি আপত্তি আছে। ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের শিষ্যরা প্রায়ই বলে থাকে, কুরআনে অনেক ভুল আছে। যদি এটি আল্লাহর কালাম হত, তা হলে এখানে ভুল থাকার কথা না। যারা এ সব কথা বলে, তারা সাধারণত তিন ধরনের ভুলের কথা বলে :

১. ভাষাগত ভুল
২. তথ্যগত ভুল
৩. একাধিক আয়াতের পারস্পরিক বাহ্যিক বিরোধ
এই তিন পয়েন্টে কিছু বলা যাক!

ভাষাগত ভুল

সাধারণত কুরআনের কিছু আয়াত ও শব্দ এনে ভাষাগত ভুল প্রমাণের চেষ্টা চালানো হয়। এখানে তিনটি বিষয় বোঝা জরুরি :

১. নবীজির সময়কালে কুরাইশদের ভাষা ছিল আরবির শ্রেষ্ঠতম ধারা। শুধু মুমিন নয়, বরং কুরাইশের কাফেররাও এই ভাষার গভীরে পৌঁছুতে সমর্থ ছিলেন। ভাষার প্রতিটি ধারা ও বাঁক ছিল তাদের নখদর্পণে। যদি এই কুরআন নবীজি সা. নিজেই রচনা করতেন, তা হলেও এতে ভুল থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকত না। শুধু নবীজি কেন—উতবা, শায়বা বা আবু জেহেলও যদি কুরআন রচনা করত, তবুও তা ভাষাগত দিক থেকে নির্ভুল হত! কারণ, ভাষার উপর তাদের দক্ষতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। ফলে কুরআনে ভুল থাকার বিষয়টি একেবারেই অবান্তর, যার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২. সাধারণত কুরআনে ভাষাগত যে সব ভুল প্রচার করা হয়, এগুলো আরবি ব্যাকরণের কোনো নিয়মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, আরবি ব্যাকরণের নিয়মগুলো গড়ে উঠেছে কুরআন নাজিলের অন্তত ৫০ বছর পর! অন্য সকল ভাষার মতোই আরবি ভাষাতেও আগে ভাষা এসেছে, ব্যাকরণ পরে তৈরি হয়েছে। আর ব্যাকরণ তৈরির সময় জাহেলি

যুগের কবিতা, সাধারণ ব্যবহৃত আরবি ও কুরআনুল কারিমকে সামনে রাখা হয়েছে। ব্যাকরণবিদরা এগুলোকে উৎস হিসাবে সামনে রেখে এখানে ব্যবহৃত শৈলীকে কাজে লাগিয়ে নিয়ম তৈরি করেছেন। অর্থাৎ কুরআনুল কারিম হল আরবি ব্যাকরণের জন্য মূল উৎস সমতুল্য। এখন কুরআনকেই যদি ব্যাকরণের পাল্লায় মাপা হয়, তা হলে এটি হবে হাস্যকর বিষয়!

৩. আরবে আগ থেকেই ভাষার একাধিক ধারা প্রচলিত ছিল। একটি বিষয়ে একাধিক মতও ছিল, যা শুদ্ধ। *আলফিয়াতু ইবনে মালিক* অধ্যয়ন করলে এমন প্রচুর উদাহরণ সামনে আসে।[১] ব্যাকরণকেন্দ্রিক জটিল আলোচনা এড়িয়ে এখানে শুধু এটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এ সব ক্ষেত্রে দুটি মতই সঠিক। ফলে নির্দিষ্ট একটিকে গ্রহণ করে অন্য একটিকে ব্যাকরণের আলোকে বাতিল বলার সুযোগ নেই।[২]

তথ্যগত বা ইলমি ভুল

মাঝেমধ্যে কুরআনের কিছু আয়াত এনে সেগুলোকে সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় এবং বলা হয়—যেহেতু এই আয়াতটি বিজ্ঞানের বিপরীত বক্তব্য দিচ্ছে, এর অর্থ হল, কুরআন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়। এ ধরনের সংশয়ের একটি উদাহরণ হল জুলকারনাইনের বিশ্বভ্রমণ সম্পর্কিত আলোচনা। যেমন, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ্ এরশাদ করেন—

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا

চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছুল, সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল এবং সে সেখানে দেখতে পেল এক সম্প্রদায়কে।[৩]

---

১. *শারহু ইবনে আকিল*, ১/৫৭; *আলফিয়াতু ইবনে মালিক*, ১/৫৮

২. বিখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ বিন ফারিসের (মৃত্যু: ৩৯৫ হিজরি) মতে আরবিতে হরকত এবং সাকিন-কেন্দ্রিক অনেক পার্থক্য আছে, যেখানে দুটি মতই সহিহ। (দেখুনড়*আস-সাহিবি ফি ফিকহিল লুগাহ*, ২৫) শায়খ তাহের ইবনে আশুর তার তাফসিরগ্রন্থ *আত-তাহরির ওয়াত তানভিরে* এমন বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করেছেন এবং উদাহরণসহ দেখিয়েছেন, কুরআনুল কারিমে ব্যাকরণগত ভুল নেই। বরং আপত্তিকারীরাই ভুলে লিপ্ত।

৩. সুরা কাহাফ, ৮৬

এই আয়াতটি সামনে এনে নাস্তিকদের কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে—সূর্য কীভাবে পৃথিবীর কোনো স্থানের ভিতরে অস্ত যেতে পারে, যেখানে এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়? তাদের এই প্রশ্নটি নিতান্ত হাস্যকর হওয়াসত্ত্বেও আরব তরুণদের একাংশ তাদের এই সংশয় গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ এই আয়াতেই স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'জুলকারনাইন সূর্যকে অস্তগমন করতে দেখল'—অর্থাৎ এখানে জুলকারনাইন খালি চোখে যা দেখেছেন, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন, আমরা দেখি, ভোরে পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উদয় হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, সারা রাত সূর্যটি পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল! কেউ যদি বলে, পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উদয় হতে দেখেছি—এর অর্থ এই নয় যে, সে বলতে চায়, সূর্য পাহাড়ের আড়ালে ছিল। দর্শকের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে, সেটা বলা আর মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করা—এক নয়। এই আয়াতের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, শুরু থেকেই মুফাসসিররা আয়াতের সঠিক মর্ম স্পষ্ট করেছেন। ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'দৃষ্টিসীমার দিকে তাকালে মনে হয় যে, সূর্য ওখানেই ডুবে যাচ্ছে।'[১]

কাজি বায়জাভি রহ. বলেন, 'জুলকারনাইন সম্ভবত ভূমধ্যসাগরে পৌঁছেছিলেন, যেখানে তার দৃষ্টিসীমায় পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। সেখানেই তিনি সূর্য অস্ত যেতে দেখেন। এই জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে—'অস্তগমন করতে দেখল'। বলা হয়নি—সেখানে অস্ত গিয়েছিল।'[২] *তাফসিরে জালালাইনে* এসেছে, 'সূর্যাস্ত চোখের দেখায় এমন মনে হয়েছিল, নচেৎ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়।'[৩]

তথ্যগত ভুল ধরতে আরেকটি আয়াতকে সামনে আনা হয়। যেমন—

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ

তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন।[৪]

এই আয়াতকে সামনে এনে এক শ্রেণির লোক বলে থাকে, এখানে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে। অথচ বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবী গোলাকার এবং

---

১. *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ৫/৫১১
২. *তাফসিরে বায়জাভি*, ৩/২৯১
৩. *তাফসিরে জালালাইন*, ১/৩০৩
৪. সুরা রাদ, ৩

মানুষের অভিজ্ঞতা থেকেও বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সর্বসম্মত মতের সঙ্গে কুরআনের আয়াত সাংঘর্ষিক হয়ে গেছে। এটাও এক অবাস্তব দাবি। কারণ, পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বিষয়টি নতুন নয়। বরং প্রাচীনকাল থেকেই বিষয়টি সবার কাছে স্বীকৃত এবং ইসলামও এর বিরোধিতা করেনি। ইবনে হাজম লিখেছেন, 'ইলমের জগতে ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এমন কেউ পৃথিবীর গোলাকার হওয়াকে অস্বীকার করেননি। বরং কুরআন-সুন্নাহতেই প্রমাণ আছে পৃথিবী গোলাকার।'[১] আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাও মুফাসসিরগন বহু শতাব্দী আগেই করে গেছেন। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি এই আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন, 'যদি কেউ বলে, এই আয়াতে পৃথিবীর গোলাকার হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে, তা হলে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পৃথিবীর আয়তন বিশাল। গোলাকার বস্তু যখন বিশালাকারের হয় তখন এর প্রতিটি অংশকেই সমতলের মতো দেখায়।'[২]

একাধিক আয়াতের বাহ্যিক বিরোধ

নাস্তিক-মুরতাদদের আপত্তির বড় একটি জায়গা হল, কুরআনের আয়াতসমূহের বাহ্যিক বিরোধ। তাদের মতে, কুরআনের আয়াতে প্রচুর বিরোধ দেখা যায়। একই বিষয়ে দুই রকম বক্তব্য দেখা যায় আয়াতগুলোতে। মানুষের কথার ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কালামের ক্ষেত্রে তো এমন হতে পারে না। এখানে তাদের বিভ্রান্তি হল, তারা ধরে নিয়েছে আয়াতগুলোর মধ্যে বিরোধ আছে। কিন্তু এই দাবিটিই মিথ্যা। তারা আসলে আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট ও সঠিক মর্ম অনুধাবনে অক্ষম। হয়তো এ বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান করেনি অথবা সঠিক জ্ঞান নেই তাদের কাছে।

কুরআনের আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে হলে আরবি ভাষার উপর থাকতে হয় গভীর জ্ঞান। শব্দগুলোর মর্ম, প্রয়োগক্ষেত্র, ভিন্নতা ও অর্থের বৈচিত্র্য যদি জানা না থাকে, তা হলে অনেক স্বাভাবিক বিষয়কেও মনে হয় দুর্বোধ্য। মুফাসসিরগণ বারবার তাদের লেখায় বিষয়গুলো আলোচনা করে বিভ্রান্তির দরজা আটকে দিয়েছেন। অনেকে এ বিষয়ে পৃথক গ্রন্থই রচনা করেছেন। এর মধ্যে আমিন শানকিতি রচিত *দাফউ ইহামিল ইজতিরাব আন আয়িল কিতাব* উল্লেখযোগ্য।

---

১. *আল-ফসল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল*, ২/৭৮
২. *তাফসিরে কাবির*, ১৯/৪

বিভ্রান্তদের উপস্থাপিত দুটি আয়াত দেখা যাক। প্রথম আয়াত—

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয়, তবে তারা বলে, 'এ আল্লাহর নিকট থেকে' আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়, তবে তারা বলে, 'এ তোমার নিকট থেকে'। বলো, 'সব কিছুই আল্লাহর নিকট থেকে।'[১]

দ্বিতীয় আয়াত—

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

কল্যাণ যা তোমার হয়, তা আল্লাহর নিকট থেকে আর অকল্যাণ যা তোমার হয়, তা তোমার নিজের কারণে।[২]

এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন—কল্যাণ ও অকল্যাণ দুটিই আল্লাহর কাছ থেকে আসে। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে—অকল্যাণ হয় মানুষের নিজের কারণে। সংশয়ীরা বলতে চায়, আয়াত দুটির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আছে। মজার ব্যাপার হল, দুটি আয়াতের অবস্থানই পাশাপাশি। মধ্যে শুধু এক আয়াতের ব্যবধান। যদি এটি কোনো মানুষের তৈরি হত, তা হলে সে কি এই বিষয়ে সতর্ক থাকত না? পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ দুটি বিষয় পাশাপাশি উল্লেখ করার মতো ভুল মানুষই যেখানে করে না, সেখানে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কীভাবে এই ভুল করতে পারেন! মূলত এখানে দুই আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধই নেই। এই দুই আয়াতের পরেই আল্লাহ তায়ালা সে দিকে ইশারা করেছেন—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? এ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে আসত, তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত।[১]

---

১. সুরা নিসা, ৭৮
২. সুরা নিসা, ৭৯

এই আয়াতের মধ্যেই রয়েছে শিক্ষা। এই আয়াত আমাদের বার্তা দেয়, আগের দুটি আয়াতের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ মনে হলেও, সেখানে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালাম। যার কালামের মধ্যে কোনো বিরোধ বা অসংগতি নেই। তা হলে এই দুই আয়াতের মধ্যে সমন্বয়ের উপায় কী? এখানেই আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় মুফাসসিরদের। তারা স্পষ্ট লিখেছেন, প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মুশরিকদের ব্যাপারে। তারা প্রায়ই নবীজির নিন্দা জানানোর জন্য খরা-অনাবৃষ্টি—এ সবের জন্য নবীজিকে দায়ী করত। এই আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে জবাব দিয়ে বলছেন, 'তোমাদের এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা জমির উর্বরতা, ফসলের সমৃদ্ধি—এ সবের কিছুতেই নবীজির হাত নেই। এ সব কিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে।' দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মুমিনদের বিষয়ে। যেখানে তাদেরকে জানানো হচ্ছে—'তাদের জীবনে যে সমৃদ্ধি ও নেয়ামত আসে, তা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কারণেই আসে। অপর দিকে তাদের উপর যে বালা-মুসিবত আসে, তা কৃতকর্মের কারণেই আসে। যদিও সব কিছুর তাকদির আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন।' অর্থাৎ দুই আয়াত এসেছে ভিন্ন দুই প্রেক্ষাপটে এবং এতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই বিষয়টি না বোঝার কারণে বাহ্যিকভাবে আয়াত দুটিকে বিরোধপূর্ণ মনে হয়।

যে সব আয়াতে বিরোধের কথা বলা হয়, এগুলোর কোনোটিতেই বিরোধ নেই। বরং জ্ঞানের অভাবে এমনটা মনে হয়। তাফসিরগ্রন্থ অধ্যয়ন করলে সহজেই এই সংশয়গুলো দূর হয়ে যায়। সালাফে সালেহিন বহু আগেই এ সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন।

গ. নবীজি সা.-সংক্রান্ত সংশয়

নবীজি সা.-সংক্রান্ত দু ধরনের সংশয় উপস্থাপন করা হয়। প্রথমত, নবীজির নবুওতকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। কখনও বলা হয়, তিনি ছিলেন মানসিক রোগী। নবুওতের বিষয়টি ছিল তার কল্পনামাত্র। নাউজুবিল্লাহ! কখনও বলা হয়, বাল্যকালে পাদরি বুহায়রা তাকে নবুওতের দাবি করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কখনও বলা হয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন তোলা হয়—নবীজির চরিত্র,

---

১. সুরা নিসা, ৮২

আখলাক, গুণাবলি, ব্যক্তিজীবন নিয়ে; একাধিক বিবাহ, উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাজি.-এর সঙ্গে বিবাহ, নবীজির জিহাদি-জীবন ইত্যাদিকে সামনে এনে নবীজির বিকৃত চিত্র দাঁড় করানোর অপচেষ্টাও চালানো হয়।

নবুওত-সংক্রান্ত সংশয়

যিনি নবুওতের দাবি করবেন, তিনি অবশ্যই সিরাতে-সুরতে মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন, নিখুঁত হবেন—এই বিষয়ে সবাই একমত। সকল নবীর মধ্যেই এ সব বিষয় বিদ্যমান ছিল। অপর দিকে যারাই নবুওতের মিথ্যা দাবি করেছে, তাদের মধ্যে নানা ত্রুটি-অসংগতি ধরা পড়েছে। কেউ শারীরিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ, কারও চরিত্র ভালো না, কারও মেধা দুর্বল, কেউ মিথ্যাবাদী—সমাজের লোকেরা তার নিন্দা করে। নবীদের জীবনীর সঙ্গে যদি এ সব মিথ্যুকদের জীবন অধ্যয়ন করা হয়, তা হলে যে কারও সামনে নবীদের নবুওতের বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, নবুওতের দাবি যিনি করেন, তিনি হয়তো যুগের শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হবেন অথবা সবচেয়ে কুখ্যাত মিথ্যাবাদী হবেন—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো অবস্থা নেই।

এখন কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী—তা প্রমাণের জন্য তাদের জীবনাচার, সামগ্রিক কর্মপন্থা, আদর্শ ইত্যাদি পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট। নবীজির সামগ্রিক জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি, তাঁর শত্রুরাও তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসাবে মেনে নিয়েছে। শত্রুরাই তাঁকে উপাধি দিয়েছে 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত। শত্রুরা তাঁর নবুওত মেনে না নিলেও কখনও চারিত্রিক অসততা, খেয়ানত বা প্রতারণার অভিযোগ করতে পারেনি। কারণ, তাঁর বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা ও সত্যবাদিতা সবার সামনে এতটাই স্পষ্ট ছিল, চাইলেও এটি লুকানো সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে। ওহি পাওয়ার আগে জীবনের ৪০ বছর কুরাইশদের মধ্যেই অবস্থান করেছিলেন নবীজি সা.। প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যা তারা নবীজিকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিল। তাদের কাছে লুকানোর কিছুই ছিল না!

নবীজি সা. প্রথম যখন সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন সবাইকে জড়ো করে বলেছিলেন—'যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের পিছনে একটি অশ্বারোহী সেনাবাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তা হলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?' তখন সবাই

একযোগে বলেছিল—'আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।' তখন নবীজি সা. কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেন—'আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি।'[১] এই ঘটনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপনের আগ পর্যন্ত নবীজির প্রতি কুরাইশদের শত ভাগ আস্থা ছিল।

এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে রোমান সম্রাট হিরাকলের দরবারে। হিরাকল তখন দামেশকে অবস্থান করছিল। আবু সুফিয়ান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের অন্যতম প্রধান নেতা। একটি ব্যাবসায়িক কাফেলার সঙ্গে তিনি সিরিয়া গমন করেন। হিরাকল সংবাদ পেয়ে তাকে ডেকে পাঠান এবং নবীজি সা. সম্পর্কে জানতে চান। এক পর্যায়ে হিরাকল প্রশ্ন করেন, 'তার নবুওতের দাবির পূর্বে কি কখনও তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ?' আবু সুফিয়ান জবাব দেন, 'না।' পরে হিরাকল মন্তব্য করেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী নন, তিনি সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারেও মিথ্যাবাদী হতে পারেন না।'[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে ইবরাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। লোকজন বলাবলি করতে থাকে, ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণে এমনটা ঘটছে। যদি তিনি ভণ্ড বা প্রতারক হতেন, তা হলে এই ঘটনাকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করতেন। তিনি মেনে নিতেন যে, নিজের ছেলের মৃত্যুর কারণেই এমনটা ঘটেছে। কিন্তু আমরা দেখি, নবীজি সা. তা করেননি। বরং তিনি সবাইকে সতর্ক করে বলেন, 'চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনমাত্র। কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ সবের গ্রহণ হয় না।'[৩] একজন সত্যবাদী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এভাবে অকপটে মূল বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া।

নবীজির সত্যতার দলিল হিসাবে কুরআনুল কারিমের কিছু আয়াতও উপস্থাপন করা যায়, যেখানে আল্লাহ তায়ালা নবীজির কিছু বিষয়কে অপছন্দ করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যেমন—

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ (١) أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ (٣)

---

১. সুরা সাবা, ৪৬
২. *বুখারি*, ৭
৩. *বুখারি*, ১০৪৩

সে ভ্রুকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ, তার নিকট অন্ধ লোকটি এল। তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত![1]

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ

তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।[2]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইছ। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[3]

নবীজি সা. যদি সত্য নবী না হতেন, তা হলে তিনি কি এই আয়াতগুলো কুরআনুল কারিমে রাখতেন? তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী। তাই ওহির কিছুই গোপন করেননি উম্মতের কাছে। সব কিছু পৌঁছে দিয়েছেন আমানতের সঙ্গে। এই হল নবীজির নবুওত প্রমাণের এক দিক। অপর দিকে আবু বকর সিদ্দিক রাজি.-এর মতো সত্যবাদী সাহাবিও তাঁকে সত্যায়ন করেছেন, তার নবুওত মেনে নিয়েছেন। সিদ্দিক যাকে সত্যায়ন করেন, তাকে অবিশ্বাস করা বড় মাপের বোকামি!

নবীজির নবুওতের আরেকটি দলিল—কুরআনুল কারিম। এটি অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। নবীজির পক্ষে এমন একটি গ্রন্থ তৈরি করা সম্ভব ছিল না। কারণ, তিনি লেখাপড়া জানতেন না। এ জন্য কুরআন বারবার চ্যালেঞ্জ করেছে—পারলে কেউ এর সমকক্ষ একটি গ্রন্থ তৈরি করে দেখাক! কিন্তু কুরাইশরা আরবি সাহিত্যে অত্যন্ত দক্ষ হলেও এর সমকক্ষ কিছু লেখার সাহস করেনি। দুয়েকজন কিছুটা চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা নিজেরাই টের পায় নিজেদের দুর্বলতা। কুরআন নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছে-

---

১. সুরা আবাসা, ১-৩
২. সুরা আহজাব, ৩৭
৩. সুরা তাহরিম, ১

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বলো, 'যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।'[১]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোনো সুরা আনয়ন করো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান করো। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনওই তা করতে পারবে না—তবে সেই আগুনকে ভয় করো, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন—কাফেরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।[২]

এখানে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, কাফেররা কখনওই কুরআনের মতো আরেকটি গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না এবং বাস্তবেও তারা পারেনি। কুরআন সত্য হওয়ার সবচেয়ে বড় দলিল এটিই। কুরআনুল কারিমে ভবিষ্যতের কিছু বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন, রোমানদের বিরুদ্ধে পারসিকদের জয়ের পরে আয়াত অবতীর্ণ হয়—

الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥)

---

১. সুরা বনি ইসরাইল, ৮৮
২. সুরা বাকারা, ২৩-২৪

আলিফ লাম মিম। রোমানগণ পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেই দিন মুমিনগণ আল্লাহর সাহায্যে হর্ষোৎফুল্ল হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।[১]

কুরআন যখন এই আয়াত কাফেরদের সামনে উপস্থাপন করে, তখন পর্যন্ত কারও ধারণাই ছিল না যে, রোমানরা বিজয়ী হতে পারে; বরং পারস্যের প্রতি সবার আস্থা ছিল বেশি। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেল, কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে!

কুরআন যখন অবতীর্ণ হয়, তখনকার আরব জাতি পূর্ববর্তী নবী-রাসুল ও জাতিসমূহ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। তাদের কাছে সংরক্ষিত কোনো ইতিহাস ছিল না। আহলে কিতাবদের কাছে পূর্ববর্তী কিতাবের সামান্য কিছু অংশ ছিল। কিন্তু দেখা গেল, কুরআন পূর্ববর্তী অনেক জাতির ইতিহাস বিস্তারিত জানাচ্ছে। নবীদের ঘটনা জানাচ্ছে। এমনকি অনেক সময় আহলে কিতাবদের কাছে-থাকা উৎসকেও সত্যায়ন করছে। এটা নিঃসন্দেহে কুরআনের অলৌকিকত্ব। কুরআন যদি আল্লাহর কালাম না হত, তা হলে নবীজির পক্ষে সম্ভব ছিল না এত নিখুঁতভাবে অতীতের ঘটনাবলি বর্ণনা করা। কুরআন যখন মুসা আ.-এর ঘটনা বিবৃত করছে, তখন কি চমৎকারভাবে বলছে—

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٦)

মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম। অতঃপর তাদের বহু

১. সুরা রুম, ১-৫

যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তুমি তো আমার আয়াত তেলাওয়াত করার জন্য মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না। তাদের কাছে আমিই তো ছিলাম রাসুল-প্রেরণকারী। মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, তখন তো তুমি তুর পাহাড়ের পাশে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[১]

এখানে প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এই ঘটনাগুলোর সময় নবীজি সা. সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এ সবের প্রত্যক্ষদর্শীও নন। আল্লাহ দয়া করে এ সব ঘটনা বিবৃত করছেন, যেন নবীজি সা. তার উম্মতকে সতর্ক করতে পারেন। নুহ আ.-এর ঘটনা বর্ণনার সময়ও আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন—

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (٤٩)

এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহির মাধ্যমে অবহিত করছি, যা তুমি এর আগে জানতে না আর জানত না তোমার সম্প্রদায়ও। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করো; শুভ পরিণাম মুত্তাকিদেরই জন্য।[২]

যে ঘটনাগুলো নবীজি সা. জানতেন না, কুরাইশ জানত না—সেগুলোও কুরআন বিবৃত করেছে সঠিকভাবে, সবিস্তারে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, নবীজি সা. ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসুল এবং কুরআন আল্লাহর কালাম। নবীজির নবুওতের আরেকটি বড় প্রমাণ নবীজির মোজেজাসমূহ—যা বিশ্বস্ত সূত্রে, বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: নবীজির জন্য খেজুর গাছের ডাল কান্না করেছিল, যা উপস্থিত সবাই শুনতে পেয়েছেন; অনেক সময় নবীজির হাতের ছোঁয়ায় খাবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অল্প খাবারও অনেকে তৃপ্তি ভরে খেতে পেরেছেন। এ ধরনের আরও অনেক মোজেজা হাদিসগ্রন্থসমূহে উল্লেখ

---

১. সুরা কাসাস, ৪৪-৪৬
২. সুরা হুদ, ৪৯

আছে। এগুলো বর্ণিত হয়েছে এমন সব সূত্রে, যা অবিশ্বাসের সুযোগই নেই। এই মোজেজাগুলো নবীজির নবুওতের এক বড় প্রমাণ।

নবীজির নবুওতের ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণও ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যেমন কুরআনের আয়াত—

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ

যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজিল, যা তাদের নিকট আছে, তাতে লিপিবদ্ধ পায়।[১]

পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহেও নবীজির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে; কিন্তু পরে আহলে কিতাবরা এ সব গ্রন্থ বিকৃত করে ফেলে। কিন্তু বিকৃত করে ফেলার পরেও সে সব গ্রন্থে এখনও ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু অংশ টিকে আছে। বিকৃত ইনজিল ও তাওরাতে এখনও এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায়, মূল গ্রন্থে নবীজি সা. সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। যেমন, ইউহান্না-অংশে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে ঈসা আ. বলেছিলেন—'আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী। আমি যতক্ষণ যাব না, ততক্ষণ তিনি তোমাদের কাছে আগমন করবেন না।' এই কথার সারমর্ম কুরআনের আয়াতেও দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

স্মরণ করো, মরিয়ম-তনয় ঈসা বলেছিল, 'হে বনি ইসরাইল, অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে, আমি তার প্রত্যায়নকারী এবং আমার পরে 'আহমদ' নামে যে রাসুল আসবেন, আমি তার সুসংবাদদাতা।' পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এল, তখন তারা বলতে লাগল, 'এ তো এক স্পষ্ট জাদু।'[২]

---

১. সুরা আরাফ, ১৫৭

২. সুরা সাফ, ৬

বাইবেলের আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, ঈসা আ. বলছেন, 'তোমরা আমাকে কোনো ব্যক্তি বলে মনে কর। আমি তিনি নই। আমার পরে আরেকজন আসবেন, আমি যার পাদুকা বহনেরও যোগ্য নই।' এ ধরনের প্রচুর বর্ণনা এখনও বাইবেলের সংস্করণগুলোতে বিদ্যমান। কিছু সংস্করণে, এমনকি মক্কার কোথাও পাওয়া যায়—যদিও সেখানে এসেছে কুরআনে বর্ণিত শব্দ 'বাক্কা' হিসাবে। *এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য বাইবেলের* সংকলকরাও স্বীকার করেছেন *বাইবেলে* মক্কার উল্লেখ আছে।[১]

নবীজির সিরাত সম্পর্কিত সংশয়

নবীজির সিরাত সম্পর্কিত সংশয়গুলো আবর্তিত হয় নবীজির ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে। এ সব অভিযোগের মধ্যে কুখ্যাত একটি অভিযোগ হল, বনু কুরাইজার অভিযান ও তাদেরকে হত্যার ঘটনা।

বনু কুরাইজার ঘটনা ঘটে সপ্তম হিজরিতে, খন্দকের যুদ্ধের পরে। বনু কুরাইজা ছিল একটি ইহুদি গোত্র, যারা নবীজির সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছিল। খন্দকের যুদ্ধের পর জিবরাইল আ.-এর নির্দেশে নবীজি সা. বনু কুরাইজার বসতিতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং পরে সেখানকার পুরুষদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করা হয়। এই ঘটনাকে সামনে এনে নবীজিকে যুদ্ধবাজ ও হিংস্র ব্যক্তি প্রমাণের চেষ্টা করে অনেকে।

অথচ এখানে প্রথম অপরাধী বনু কুরাইজা নিজেই! নবীজির সঙ্গে শান্তিচুক্তি থাকাসত্ত্বেও তারা মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে হাত মেলায় এবং মুসলমানদের জান-মালকে হুমকির মুখে ফেলে। অথচ নবীজির দিক থেকে শান্তিচুক্তি ভঙ্গের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। সম্পূর্ণ বিনা কারণে তারা এই চুক্তি লঙ্ঘন করে, যা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিদ্রোহ। কুরআনুল কারিম সে সময়কার ঘটনাবলি চিত্রিত করেছে এভাবে—

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١)

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন—মুনকিজ সাকারের বই *হাল বাশশারাল কিতাবুল মুকাদ্দাস বি মুহাম্মদ*, নাসরুল্লাহ আবু তালেবের বই *তাবাশিরুল ইনজিল ওয়াত তাওরাহ বিল ইসলামি ওয়া রাসুলিহি*, ফয়সাল আলি কামেলির বই *ইয়াজিদুনা মাকতুবান ইনদাহুম।*

যখন তারা তোমাদের উপর ও নিচের দিক থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল—তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল ভীষণভাবে।[১]

বনু কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মদিনার মুসলমানরা এক ভয়াবহ সময়ের মুখোমুখি হয়। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকরার অপরাধে তাদেরকে যে কোনো শাস্তি দেওয়ার অধিকার নবীজির ছিল এবং তিনি সেই কাজটিই করেছেন। বনু কুরাইজার সঙ্গে যা হয়েছে, তা তাদের কৃত অপরাধের শাস্তিমাত্র! এ ক্ষেত্রে তাদের উপর বিন্দু-পরিমাণ জুলুমও করা হয়নি।

দ্বিতীয় বিষয় হল, নবীজি সা. নিজে বনু কুরাইজার উপর এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছেন, এমন নয়। বরং নবীজি সা. বলেছেন, 'সাদ ইবনে মুয়াজ (যিনি পূর্বে ইহুদি ছিলেন) এই বিষয়ে ফয়সালা করবেন।' তখন ইহুদিরা বলেছিল, 'এমনটি হলে আমাদের সন্তুষ্ট না হওয়ার কোনো কারণই নেই। আমরা এর উপর সন্তুষ্ট।' নবীজি সা. তখন সাদ ইবনে মুয়াজ রাজি.-কে ডেকে পাঠান। তিনি মদিনায় অবস্থান করছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি আহত হন, যে কারণে বিশ্রামে ছিলেন। তিনি এলে বনু কুরাইজার লোকজন বলাবলি করতে থাকে, 'হে সাদ, স্বীয় হালিফদের[২] সঙ্গে উত্তম ও কল্যাণকর মীমাংসা করবেন। রাসুলুল্লাহ আপনাকে এ জন্যই বিচারক নির্বাচিত করেছেন যে, আপনি তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন।' সাদ রাজি. কোনো জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন। এরপর তিনি নবীজির সামনে যান। নবীজি সা. তাকে বনু কুরাইজার ব্যাপারে ফয়সালা করতে বলেন। তিনি বলেন, 'তাদের সম্পর্কে আমার বিচারের রায় হচ্ছে এই যে—পুরুষদের হত্যা করা হোক, মহিলা ও শিশুদের বন্দি করে রাখা হোক আর বণ্টন করে দেওয়া হোক তাদের সম্পদসমূহ।' নবীজি সা. তখন বলেন, 'তুমি তাদের ব্যাপারে সেই বিচারই করেছ, যা আল্লাহ তায়ালা করেছেন।' সিরাতের গ্রন্থসমূহে এই ঘটনা বিস্তারিত এসেছে। অর্থাৎ ইহুদিরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা সাদ ইবনে মুয়াজের ফয়সালা মেনে নেবে। অনেকে বলে থাকে—সবাইকে হত্যা

---

১. সুরা আহজাব, ১০-১১
২. মিত্রপক্ষ

করার কারণ কী? এর কারণ হল, তাদের একাংশ সরাসরি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, অন্য অংশ এতে সন্তুষ্ট ছিল। সামগ্রিকভাবে তারা অপরাধ করেছে, ফলে সামগ্রিকভাবেই তাদের শাস্তি হয়েছে।

নবীজির পারিবারিক জীবনের যে সব অংশ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, এর মধ্যে আছে উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা রাজি.-এর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা। নাস্তিক্যবাদীরা প্রায়ই বলে থাকে, নবীজি সা. তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার স্বামীকে হত্যা করেন এবং তার ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে বিবাহ করেন। নাউজুবিল্লাহ! এই অভিযোগ শত ভাগ বানোয়াট। তাদের পক্ষে দুর্বল কোনো বর্ণনাও নেই। বরং *বুখারি-মুসলিমের* বর্ণনায় স্পষ্ট দেখা যায়, নবীজি সা. ইদ্দত পালনের পরেই তাকে বিবাহ করেন।[১]

ঘ. ইসলামি শরিয়া সম্পর্কিত সংশয়

মুমিনদেরকে বিভ্রান্ত করতে নাস্তিক-মুরতাদ, সেক্যুলাররা প্রায়ই ইসলামের ব্যাপারে বেশ কিছু আপত্তি উপস্থাপন করে। কখনও বলে—ইসলাম নারীদের অধিকার দেয়নি। কখনও বলে—ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম, অন্যায় রক্তপাত ঘটানোই এর কাজ। কখনও বলা হয়—ইসলামি ফৌজদারি আইন মানবতাবিরোধী ইত্যাদি ইত্যাদি।

নারীদের উত্তরাধিকার আইন নিয়েই বলা যাক! সাধারণত বলা হয়, সম্পদ বণ্টনে নারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের চেয়ে পুরুষকে বেশি অংশ দেওয়া হয়েছে, যা ইনসাফ নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল, বিষয়টি এত সরল নয়। মিরাসের ইস্যুতে অনেকগুলো ধাপ আছে। সব ধাপে নারীদেরকে সমান অংশ দেওয়া হয়নি। কোনো ধাপে নারীদেরকে পুরুষের চেয়ে বেশি অংশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও পুরুষের সমান দেওয়া হয়েছে, কোথাও শুধু নারীদেরকেই দেওয়া হয়েছে—সেখানে পুরুষকে দেওয়া হয়নি, কোথাও নারীদেরকে পুরুষের চেয়ে কম দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণ দেওয়া যাক! যদি কোনো মহিলা মারা যায় এবং তার স্বামী ও একজন কন্যা জীবিত থাকে, তা হলে স্বামীর চেয়ে মেয়ে বেশি পাবে। যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং পিতা-মাতা ও সন্তান রেখে যায়, তা হলে পিতা

---

১. *বুখারি*, ৩৫৬, ২২৩৫, ১৯৩০, ৫২৫৪; মুসলিম, ১৩৬৫

ও মাতা দুজনেই সমান অংশ পাবে। অর্থাৎ নারী সব সময় পুরুষের অর্ধেক পাবে, বিষয়টি এত সরল নয়। একটি আয়াত দেখা যাক। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

> যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে, যার রয়েছে এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নি—তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে এক-তৃতীয়াংশে সমঅংশীদার হবে। যা ওসিয়ত করা হয়, তা এবং ঋণ পরিশোধের পর এটা (প্রযোজ্য হবে)—যদি কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।[১]

পুরুষকে যদিও কিছু অংশে মহিলাদের চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে এমন কিছু খরচের খাত দেওয়া হয়েছে—যা মহিলাদেরকে দেওয়া হয়নি। যেমন: বিবাহের সময় তাদেরকে মোহর দিতে হয়; বিবাহের পর স্ত্রীর ভরণপোষণের যাবতীয় দায়িত্ব তার—এমনকি স্ত্রী যদি ধনীও হয়, তবু স্বামীকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। নারীদের জন্য এত কিছুর ব্যবস্থা করার পরেও কী করে বলা যায়, তাদের উপর ইসলাম জুলুম করেছে! হ্যাঁ, ইসলাম সব সময় সমতা রক্ষা করেনি। কারণ, সমতা মানেই 'ইনসাফ' না। সমতা অনেক সময় জুলুমে রূপ নেয়।

নারী-পুরুষের বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের প্রকৃতি ও সার্বিক বিষয়ে লক্ষ করেছে। যেমন, নারীদের জন্য স্বর্ণ অত্যন্ত আকর্ষনীয় বস্তু। স্বর্ণ নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে, অপর দিকে পুরুষের জন্য তা নিষিদ্ধ। ইসলাম জিহাদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায়ও জিহাদ শুধু পুরুষের উপর আবশ্যক করা হয়েছে, মহিলাদের জন্য আবশ্যক করা হয়নি। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাজি. বলেন, 'আমি একবার নবীজির কাছে

---

১. সুরা নিসা, ১২

জিহাদের অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, 'হজই তোমাদের জিহাদ।'[১] ইবনে বাত্তাল বলেন, 'এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, মহিলাদের উপর জিহাদ আবশ্যিক নয়।' দেখা যাচ্ছে, ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা করেনি, বরং উভয়ের উপর ইনসাফ করেছে।

যারা নারীদের বিষয় নিয়ে আপত্তি তোলে, অনেক সময় তারা মুসলিম-সমাজের একাংশের ভুল ও জুলুম দ্বারা দলিল দেয়। ব্যক্তির কাজকে তারা ইসলামের বিধান বলে চালিয়ে দেয়। যেমন: কেউ জোরপূর্বক বালেগ মেয়েকে তার অনিচ্ছায় কোথাও বিয়ে করতে বাধ্য করছে। এখন সেই ব্যক্তি যদি মুসলিম হয়, তা হলে বলা হবে—দেখো, ইসলাম এমনটা করছে। অথচ ইসলামের বিধান এমন নয়। বরং নবীজি সা. বলেছেন, বালেগার ক্ষেত্রে তার থেকে অনুমতি নিতে। তারা এ সব খণ্ডিত বিষয় সামনে আনলেও ইসলাম নারীদের যে সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে, সেই বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যায়। শুধু মুসলিম নারী নয়, অমুসলিম নারীদের ক্ষেত্রেও ইসলাম অনেক ছাড় দিয়েছে। যেমন: ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া নেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু তা নারীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে না! ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'নারী, শিশু ও পাগলের দায়িত্বে জিজিয়া নেই। এটিই চার মাজহাবের স্বীকৃত মত।' ইবনে মুনজির ও আবু মুহাম্মদ বলেন, 'এর বিপরীত কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই।'[২]

এতগুলো বিষয় সামনে রেখে বিবেচনা করলে কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, ইসলাম নারীদেরকে অধিকার দেয়নি, জুলুম করেছে।

ইসলামের ব্যাপারে যারা আপত্তি করে, নারীর অধিকার বিষয়ক আপত্তিটির মতোই তাদের অন্যান্য বিষয়ের আপত্তিগুলো। এর কোনো সার বা ভিত্তি নেই। এর পিছনে রয়েছে কেবলই জানার অজ্ঞতা, স্বপ্রণোদিত বিদ্বেষ কিংবা সত্যান্বেষণের অভাব। হাজার বছর ধরে তাদের এ সব আপত্তির অসংখ্য জবাব ও সঠিক পথের সন্ধান উলামায়ে কেরাম নানাভাবে দিয়ে এসেছেন, এখনও দিচ্ছেন। তাই নিজের মধ্যে খামতি রেখে এ সব আপত্তি থেকে উত্তরণ কোনো দিনই সম্ভব না।

---

১. *বুখারি*, ২৮৭৫

২. *আহকামু আহলিজ জিম্মাহ*, ১/১৪১; *আল-মুগনি*, ৯/৩৩৮; *আল-ইজমা*, ৬৩

২. ইসলামের শাখাগত বিভিন্ন বিষয়ে বিভ্রান্তি ও সংশয়

ক. হাদিসের উপর আপত্তি ও সংশয়

সাম্প্রতিক সময়ের বড় একটি ফেতনা হল, কুরআনিস্টদের ফেতনা। এই ফেতনার প্রচারকদের মতে হাদিস একটি সন্দেহযুক্ত বিষয়, যার উপর নির্ভর করা যায় না। আমাদের সকল কাজের নির্দেশনা আল-কুরআনেই আছে। এর বাইরে কিছু দরকার নেই। নিজেদেরকে তারা আহলে কুরআন বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু হাদিস অস্বীকার করে কেউ কুরআন অনুসরণ করতে পারে না।[১] ফলে তাদেরকে আহলে কুরআন না বলে মুনকিরে হাদিস বা হাদিস-অস্বীকারকারী বলাই ভালো।

কুরআনিস্টরা যেহেতু শুরুতেই হাদিসকে বাতিল করে দেয়, ফলে তারা একের পর এক শরিয়ার বিধানকে অস্বীকার করে। নিজেদের মতের সপক্ষে তারা কুরআনের একটি আয়াতকে উপস্থাপন করে—

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

কিতাবে কোনো কিছুই আমি বাদ দিইনি।[২]

কুরআনিস্টদের মতে এই আয়াত থেকেই বোঝা যায়, কুরআনের পর আর কিছু মানার দরকার নেই, হাদিসের প্রয়োজন নেই! হাদিস অস্বীকারের ধারা শুরু হয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুতাজিলাদের হাত ধরে। নিজেদের আকলের পরিপন্থি মনে করায় অনেক হাদিসকে তারা অস্বীকার করে। পরবর্তী সময়ে শিয়াসহ আরও একাধিক ফেরকা এই কাজটি করে। নাসেবিদের অনেকে আলি রাজি.-এর ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে অস্বীকার করে। কিন্তু তাদের এই অস্বীকার ছিল বিক্ষিপ্ত। এর নির্দিষ্ট কোনো কাঠামো বা মূলনীতি ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে কাঠামোবদ্ধভাবে হাদিস অস্বীকারের প্রবণতা গড়ে ওঠে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, হামিদুদ্দিন ফারাহি, আবদুল্লাহ চকরালভি, গোলাম আহমদ পারভেজ প্রমুখ ছিলেন এই ধারার সম্মুখনায়ক।

পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বাইরেও এই ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে মডার্নিস্টদের একটি বড় অংশ এতে তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশেও

---

১. যেভাবে ফিকহ অস্বীকার করে কেউ হাদিস অনুসরণ করতে পারে না।
২. সূরা আনআম, ৩৮

সাম্প্রতিককালে এই ফেতনা বেড়ে চলেছে। অনলাইনের কল্যাণে এই ধারার লেখক সজল রোশানের লেখাজোখার প্রচারণাও চোখে পড়ার মতো। কিছু গুচ্ছ প্রতিষ্ঠান তো বটেই, বড় বড় কিছু বইয়ের প্রতিষ্ঠান নিয়মিত সজল রোশানকে প্রমোট করছে, তার বইয়ের প্রচারণা চালাচ্ছে। ডাক্তার মতিয়ার রহমান নামে আরেকজন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে কৌশলে এই মতবাদ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার ফাঁদে পড়ে অনেক সরলমনা আলেমরাও অনেক সময় তার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মশালায় অংশ নিচ্ছেন।

কুরআনিস্টরা সাধারণত নিজেদের কথার পক্ষে একটি আয়াতকে হাজির করে। আয়াতটি হল—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

আমি আত্মাসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।[১]

কুরআনিস্টদের মতে এই আয়াতে বলা হয়েছে—সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, ফলে শরিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে কুরআন ব্যতীত আর কিছু দরকার নেই। কিন্তু তাদের এই ব্যাখ্যা ভুল। এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে—শরিয়ার বিধানের জন্য কুরআন যথেষ্ট, হাদিসের আর প্রয়োজন নেই। বরং আয়াতের সঠিক মর্ম মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত মুফাসসির বায়জাভি রহ. লিখেছেন, ''লিকুল্লি শাই' বা সকল বিষয়ের অর্থ হল, কুরআন দ্বীনের বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছে অথবা সামগ্রিকভাবে উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনার ভার সুন্নাহ ও কিয়াসের উপর ছেড়ে দিয়েছে।'[২]

মাহমুদ আলুসি বাগদাদি রহ. বলেন, 'স্পষ্ট করার অর্থ হল, কিছু বিষয়ে সরাসরি নস দেওয়া হয়েছে আর বাকিগুলো সামগ্রিকভাবে উল্লেখ করে নবীজিকে অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন—

---

১. সুরা নাহাল, ৮৯

২. *আনওয়ারুত তানজিল ওয়া আসরারুত তাবিল*, ৩/২৩৭

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।[১]

কোথাও আবার ইজমা অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন—

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

কারও নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায়, সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!'[২]

একই কথা বলেছেন আল্লামা শাওকানিও।[৩]

কুরআনিস্টদের তৃতীয় দলিল হল কুরআনের আয়াত—

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

বলো, 'তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শালিশ মানব, যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন!' আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা জানে যে, তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৪]

কুরআনিস্টদের মতে যারা হাদিস অনুসরণের কথা বলে, তারা মূলত আল্লাহর কিতাব বাদে অন্য কিছুকেই শালিশ মানতে চায়। এ জন্য প্রায়ই তারা

---

১. সুরা নাজম, ৩

২. সুরা নিসা, ১১৫

৩. *ফাতহুল কাদির*, ৩/১৮৭

৪. সুরা আনআম, ১১৪

আহলুস সুন্নাহর অনুসারীদের মুনাফিক, মুশরিক ও কাফের বলে আখ্যা দেয়! এক দিকে কুরআনিস্টরা হাদিস অস্বীকারের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ার মূল কাঠামোতেই আঘাত করে, একের পর এক শরিয়ার বিধানগুলো অস্বীকার করে—অপর দিকে আহলুস সুন্নাহকে তারা বলে, কাফের! এর চেয়ে হাস্যকর ও অন্ধ গোঁয়ার্তুমি আর কী হতে পারে!

এই আয়াতের ক্ষেত্রেও তারা আশ্রয় নেয় কারচুপি ও ভুল ব্যাখ্যার। কুরআনের অন্য কয়েকটি আয়াত দেখা যাক—

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন ও তার পরিবার থেকে একজন শালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।[১]

এই আয়াতে তো আল্লাহ তায়ালা নিজেই একজন শালিশ নিযুক্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। তা হলে এই আয়াতের ব্যাখ্যা কী? কুরআনিস্টরা যে বলে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শালিশ মানা যাবে না, তাদের দলিল তো এই আয়াতের সামনে এসেই ভুল প্রমাণিত হয়! অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত এর হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[২]

---

১. সূরা নিসা, ৩৫
২. সূরা নিসা, ৫৮

এই আয়াতেও দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বিচার-ফয়সালার দায়িত্ব মানুষের কাঁধে অর্পণ করে তাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। তা হলে কুরআনিস্টদের দাবির বাস্তবতা রইল কোথায়!

যেখানে মুসলিমদের সাধারণ মানুষই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শালিশ বা ফয়সালার অধিকার পাচ্ছেন, তা হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন পাবেন না? তার কথা কেন অগ্রহণযোগ্য হবে? এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি আর হতে পারে না! তা ছাড়া রাসুলের আনুগত্য করা পৃথক কোনো বিষয় নয়, বরং রাসুলকে আনুগত্য করার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন। ফলে রাসুলের আনুগত্য করা মানে আল্লাহরই আনুগত্য করা। দলিল হল কুরআনের আয়াত—

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

কেউ রাসুলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল এবং কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে—তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করিনি।[১]

অন্য আয়াতে এসেছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তাদের—যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন করো আল্লাহ ও রাসুলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

---

১. সুরা নিসা, ৮০
২. সুরা নিসা, ৫৯

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুমিন হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা থাকে না এবং সর্বান্তকরণে তারা তা মেনে নেয়।[১]

প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মেনে নিতে, এমনকি নবীজির উল্লেখ করা হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গেই। অর্থাৎ রাসুলের আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য থেকে পৃথক কিছু নয়, বরং এটি আল্লাহর আনুগত্যেরই অংশ। যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করে না, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করে না!

কুরআনিস্টদের দাবির বিপরীতে কুরআনে প্রচুর আয়াত বিদ্যমান আছে, যা থেকে হাদিসের প্রামাণিকতা প্রমাণ হয়। কুরআনে মুমিন হওয়ার প্রধান শর্তই করা হয়েছে রাসুলের প্রতি ঈমান আনা। যেমন—

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

রাসুল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও (তা-ই)। তাদের সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসুলগণে ঈমান এনেছে। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না', আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।'[২]

রাসুলের দায়িত্ব কী? কুরআন বলছে রাসুলের দায়িত্ব হল উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করা এবং নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

---

১. সুরা নিসা, ৬৫
২. সুরা বাকারা, ২৮৫

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর—যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাত ও ইনজিল, যা তাদের নিকট আছে, তাতে লিপিবদ্ধ পায়। যে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে এবং শৃঙ্খল থেকে, যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, সাহায্য করে এবং যে নুর তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুসরণ করে—তারাই সফলকাম।[১]

যদি কুরআনেই সকল বিধান সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবৃত হত, তা হলে নবীজিকে আবার হালাল ও হারাম ঘোষণার দায়িত্ব দেওয়া হল কেন? এ থেকে বোঝা যায়, কুরআনে অনেক কিছু সবিস্তারে আসেনি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো সবিস্তারে উম্মতের সামনে আলোচনা করেছেন। যেমন, নামাজের বিধান-সংক্রান্ত সবগুলো বিষয় কুরআন খুলে খুলে আলোচনা করেনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমাই কুরআনে স্পষ্টকারে আসেনি! এটা এসেছে রাসুলের হাদিসে।

এক ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি এ দু দিন আমাদের সঙ্গে সালাত পড়ো।' প্রথম দিন (মধ্যাহ্নের) সূর্য (কিছুটা পশ্চিমে) হেলে যাওয়ার পর বেলাল রাজি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে জোহরের আজান দিলেন, অতঃপর ইকামত দিলেন। এরপর সূর্য উপরে সাদা থাকাবস্থাতেই বেলাল রাজি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

---

১. সুরা আরাফ, ১৫৭

নির্দেশে আসরের আজান ও ইকামত দিলেন। এরপর সূর্যাস্তের পর মাগরিব ও শাফাক (পশ্চিমাকাশের আলোক-আভা) অস্তমিত হওয়ার পর আদায় করলেন এশার সালাত। দ্বিতীয় দিন বেলাল রাজি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে জোহরের আজানে বিলম্ব করলেন। রোদের তাপ অনেক ঠাণ্ডা হওয়ার পর জোহরের সালাত আদায় করা হল। এরপর বিলম্বিত করা হল আসরের সালাতও এবং সূর্য কিছুটা উচ্চতায় থাকাবস্থায় সালাত আদায় করা হল। এরপর মাগরিব শাফাক (পশ্চিমাকাশের আলোক-আভা) অস্তমিত হওয়ার (কিছু) আগে আদায় করা হল এবং এশা বিলম্বিত করা হল রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। ফজরের সালাত আদায় করা হল চারদিকে ভালোভাবে ফর্সা হওয়ার পর। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই প্রশ্নকারীকে ডাকলেন। সাহাবি উপস্থিত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এই দুই সময়ের মধ্যেই তোমাদের সালাতের সময় নির্ধারিত।'[১]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলো নিঃসন্দেহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (ফরজ স্তরের) সুন্নাহ। এই সুন্নাহ তার বহু কওলি ও ফেলি হাদিস দ্বারা তাওয়াতুরের সঙ্গে প্রমাণিত। যুগ যুগ ধরে তা মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত কর্মধারা। প্রত্যেক যুগের উত্তরসূরিরা তাদের পূর্বসূরিদের থেকে তা গ্রহণ করেছে। এভাবে আমলের ধারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।'[২]

এ ধরনের অনেক উদাহরণ বিদ্যমান, যেখানে হাদিস ছাড়া শরিয়তের পুরো বিধানটি জানা যায় না। ফলে কুরআন অনুসরণের নাম দিয়ে হাদিস বর্জনের ডাক দেওয়া অনেক বড় এক ফেতনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই ফেতনা সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। নবীজি বলেন, 'শুনে রাখো, হয়তো এমন ব্যক্তির উদ্ভব হবে, যে তার সুসজ্জিত আসনে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে। তখন তার কাছে আমার কোনো হাদিস পৌঁছুলে সে বলে উঠবে, 'আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে তো আল্লাহর কিতাবই আছে! এতে আমরা যা হালাল হিসাবে পাব, তা হালাল হিসাবে গ্রহণ করব আর যা হারাম হিসাবে পাব, তা হারাম মনে করব।' অথচ, (প্রকৃত

---

১. *মুসলিম*, ৬১৩

২. *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ৩/৮৯

অবস্থা হল এই যে,) রাসুলুল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতোই হারাম।'[১]

মুনকিরে হাদিসদের বড় একটি আপত্তি হাদিসের বর্ণনাকারীদের নিয়ে। তাদের মতে, হাদিসের বর্ণনাকারীদের সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। হতে পারে, তারা নবীজির নামে মিথ্যাচার করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুনকিরে হাদিসরা বেশ কিছু অপপ্রচার চালায়। যেমন, তাদের মতে—আবু হুরায়রা রাজি. নবীজির সঙ্গে বেশি সময় অবস্থান করতেন খাবারের লোভে! তিনি বনু উমাইয়ার শাসকদের ভয়ে অনেক হাদিস লুকিয়েছেন! এগুলো একেবারেই নির্জলা মিথ্যাচার।

জরাহ-তাদিলের শাস্ত্র[২] সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার প্রমাণ এ সব বক্তব্য। মুহাদ্দিসরা জরাহ-তাদিল শাস্ত্রকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন, যেখানে রাবিদের মান সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে তারা নির্ধারণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কিছুই লুকানো হয়নি। ভিন্নমতের কারও উপর যেমন জুলুম করা হয়নি, তেমনি নিজ ঘরানার কাউকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। প্রতিজন রাবিকে তারা সূক্ষ্ম নিক্তিতে রেখে মেপেছেন। প্রত্যেকের সত্যবাদিতার স্তর নির্ধারণ করেছেন। *বুখারির* দিকেই লক্ষ করা যাক। এই গ্রন্থে শিয়া, সুন্নি, নাসেবি, কদরি, খারেজি নানা ফেরকার লোকদের হাদিস নেওয়া হয়েছে। এমনটা করা হয়েছে তাদের সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি ও আমানতদারিতার দিকে লক্ষ রেখে। শুধুই আকিদার ইখতেলাফের কারণে বর্ণনা বাদ দেওয়া হয়নি। অপর দিকে অনেক সুন্নি ব্যক্তির হাদিস মুহাদ্দিসরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, তাদের আমানতদারিতা ও সততা প্রশ্নবিদ্ধ। সুতরাং রাবিদের ব্যাপারে সামগ্রিক দুর্বলতার অভিযোগ করে হাদিসশাস্ত্রকেই অস্বীকারের প্রবণতা মূলত 'ইলমুল জারহি ওয়াত তাদিল'[৩] সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রমাণ করে।

মুনকিরে হাদিসদের আরেকটি বড় দাবি হল, নবীজি সা. হাদিস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে অনেক হাদিস লেখা হয়নি, হারিয়ে গেছে! এই বিষয়ে ড. মুস্তফা আজমি, আবুল মাআসির হাবিবুর রহমান আজমি, মানাজির

---

১. *তিরমিজি*, ২৬৬৪; *ইবনে মাজা*, ১২

২. জরাহ-তাদিল শাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ার শাস্ত্রীয় বিষয়ের যারা রাবি বা বর্ণনাকারী, তাদের ব্যক্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার বিচার করা হয়।

৩. ঐ

আহসান গিলানি, ইজাজ আল-খতিব প্রমুখ বিস্তারিত অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, নবীজি সা. পরে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন এবং খোদ সাহাবিদের হাতেই অনেক হাদিসের সংকলন তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ছিল সাময়িক; এর কারণ ছিল তখনও কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল। ফলে হাদিসের সঙ্গে কুরআন মিশে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ, আরবদের প্রখর স্মৃতিশক্তি যে কোনো বিষয়কে হুবহু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিল। যে আরবরা ঘোড়ার বংশলতিকা পর্যন্ত কয়েক প্রজন্ম ধরে সংরক্ষণ করতে সক্ষম ছিল, তারা নবীজির হাদিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ভুলে যাবে—এটি চিন্তা করাও কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে অসম্ভব!

হাদিস সংকলনের সময়কাল নিয়েও কথা আছে। মুনকিরে হাদিসরা সাধারণত ঢালাওভাবে বলে দেয়—হাদিস সংকলিত হয়েছে দুইশ হিজরির পরে।[১] এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। কুতুবে সিত্তাহ দুইশ হিজরির পরে সংকলিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এর আগেই অনেক হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়ে গিয়েছিল। মুহাদ্দিসুল আসর হাবিবুর রহমান আজমি *নুসরাতুল হাদিস* গ্রন্থের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, সাহাবিদের যুগে কী কী সংকলন প্রস্তুত হয়েছিল। শায়খ মুস্তফা আজমিও তার লিখিত *দিরাসাত ফিল হাদিসিন নববি ওয়া তারিখু তাদবিনিহিতে* এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখ করেছেন সাহাবিদের হাতে সংকলিত অন্তত ২৫টি ছোট পুস্তিকার কথা। সুতরাং দুইশ হিজরির আগে হাদিস সংকলিত হয়নি, এই দাবিরও ভিত্তি থাকে না।[২]

তবে হাদিস-অস্বীকারকারীদের মধ্যে নানা প্রকার আছে। কেউ কেউ সরাসরি হুজ্জিয়তে হাদিসকেই অস্বীকার করে। তাদের মতে—মুসলমানদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট, এখানে হাদিসের কোনো অবস্থান নেই। কিংবা হাদিস সংকলনের ধারাটি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নয়। আরেকটি দল আছে, যারা

---

১. এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ লোকজন, যেমন: গোলাম আহমদ পারভেজ, আজিম বেগ চুগতাই, আসলাম জয়রাজপুরি, নিয়াজ ফতেহপুরি সবার বক্তব্য এটিই ছিল। গোল্ডজিহারের অনুকরণে তারাও বলেছেন, 'হাদিস মূলত অনারবদের উপর চাপিয়ে-দেওয়া আরবীয়দের একটি ষড়যন্ত্র।'

২. আধুনিক মুনকিরে হাদিসরা অবশ্য নিজেদের পুরনো কিছু দাবি থেকে সরে আসার ভান করে কিংবা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে। এ ক্ষেত্রে ড. জোনাথন ব্রাউন, ড. ইসাম ইদু, ড. শরিফ হাতেম আল-আউনি, ড. নাবিল বালহি চমৎকার কাজ করেছেন। তাদের বইপত্রগুলো দেখা যায়।

সরাসরি হাদিস অস্বীকারের কথা বলে না, বাহ্যিকভাবে তারা হাদিস মানার কথাই বলে; কিন্তু হাদিসের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বদলে দেয়! আধুনিক কালে হামিদুদ্দিন ফারাহি, আমিন আহসান ইসলাহি, জাভেদ গামেদি, রাশেদ সাজ প্রমুখ এই ধারার মুনকিরে হাদিস। প্রথম দলের চেয়ে এই দলটি আরও বেশি ক্ষতিকর। কারণ, সহজে এদের চিন্তাধারা বোঝা যায় না।[১] আহলে হাদিস ঘরানার আলেম শায়খ সালাহুদ্দিন ইউসুফ হামিদুদ্দিন ফারাহি ও আমিন আহসান ইসলাহির চিন্তাধারার ভ্রান্তি তুলে ধরে এর খণ্ডনে বই রচনা করেছেন। সেখানে তিনি চমৎকার একটি কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মুনকিরে হাদিস মানে এক কথায় হাদিস অস্বীকার করা নয়। বরং কেউ যদি হাদিস গ্রহণের বা শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের এমন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যা মুহাদ্দিসদের স্বীকৃত উসুল ও মূলনীতি-বিরোধী, তা হলে সেও মুনকিরে হাদিস হিসাবে বিবেচিত হবে।[২]

হাদিস অস্বীকারের আরেকটি ধাপ হল, আকলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে হাদিসকে অস্বীকার করা। মুসলিমবিশ্বে এই কাজ প্রথম শুরু করেছিল মুতাজিলারা। আধুনিক কালে মডার্নিজমের অনুসারীদের মধ্যে এই প্রবণতা সর্বাধিক। কোনো হাদিসকে বাহ্যিকভাবে আকলবিরোধী মনে হলেই তারা হাদিসটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। মূলত আকলের কর্মপরিধি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবেই তাদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায়।

---

১. উদাহরণস্বরূপ, রাশেদ সাজের কথা বলা যায়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক তার একাধিক আলোচনায় বলেছেন, যারা হাদিস অস্বীকার করে, তাদের তিনি মুসলমান করেন না। কিন্তু তিনি নিজেই তার লিখিত *ইদরাকে জাওয়ালে উম্মত* গ্রন্থে হাদিসশাস্ত্রের উপর বড় বড় অনেক আপত্তি তুলেছেন। জোসেফ শাখ্‌ত ও গোল্ডজিহারের অনুকরণে হাদিসশাস্ত্রকেই প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। জাভেদ আহমদ গামেদির বিষয়টিও এমন। তিনি ও তার ভক্তরা নিজেদেরকে মুনকিরে হাদিস বলতে নারাজ। কথায় কথায় তিনি নিজেও অনেক সময় হাদিসকে উদ্ধৃত করেন। তার বইপত্রেও হাদিসের রেফারেন্স আছে। কিন্তু হাদিস সম্পর্কে তার অবস্থান তিনি *মিজান* গ্রন্থেই স্পষ্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'রাসুল সা.-এর কথা, কাজ কিংবা অন্যদের কাজের ব্যাপারে তাঁর নীরব সম্মতি ও অসম্মতি প্রদানের যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় এবং যেগুলোর অধিকাংশই খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে যাকে হাদিস বলা হয়, সেগুলোর ব্যাপারে এ কথাটি একেবারেই সুস্পষ্ট যে, এর মাধ্যমে দ্বীনের কোনো আকিদা বা আমল বৃদ্ধি করা যাবে না। দ্বীনের নতুন কোনো বিধানের উৎস হওয়া হাদিসের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে না।' (*মিজান*, ৬১) গামেদি সাহেব সরাসরি বলেছেন, 'নবীজির যে সব কাজ কুরআনে বর্ণিত হয়নি এবং পূর্ববর্তী আবরাহামিক ধর্মগুলোতেও এর চর্চা নেই, সেগুলো কোনোভাবেই অনুসরণীয় হতে পারে না।' (*মিজান*, ৬২)

২. *ফেতনায়ে গামেদিয়ত*, ১২১

নুসুসে শরিয়া বোঝার মানহাজ-সংক্রান্ত সংশয়

পৃথিবীর কোনো ভ্রান্ত মুসলিম ফেরকা বা মতবাদ এমন নেই, যারা নিজেদের দাবির সপক্ষে কুরআন-হাদিস উপস্থাপন করে না। প্রতিটি দল দাবি করছে, কুরআন-হাদিসের সঠিক মর্ম ও ব্যাখ্যা তাদের কাছেই আছে। তা হলে আহলুস সুন্নাহর সাথে তাদের তফাতটা কোথায়? একটু চিন্তা করলেই লক্ষ করা যায়, তফাতটা মূলত নুসুসের ব্যাখ্যায় ও ইজমা অনুসরণে। আহলুস সুন্নাহ যখন নুসুসকে ব্যাখ্যা করে, তারা সেই ব্যাখ্যাকেই নেয়—যার উপর সালাফের ইজমা আছে। অপর দিকে বিভ্রান্তরা নুসুস অনুসরণের দাবি করে, কিন্তু ব্যাখ্যা হয় তাদের নিজস্ব—যার সাথে সালাফদের কোনো সম্পর্ক নেই। নুসুস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সালাফকে নাকচ করার এই প্রবণতাই খুলে দেয় নতুন নতুন বিভ্রান্তির দ্বার।

সালাফ বলতে সাধারণত পুর্বসূরি যে কাউকে বোঝানো হলেও পারিভাষিক অর্থে সালাফ বলতে প্রধানত উম্মতের শ্রেষ্ঠ তিন জামাত—তথা সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িনদেরকে বোঝানো হয়। দ্বীন ও শরিয়া বোঝার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। তারা একে-অপরকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন প্রতিটি বিষয়। তারা ছিলেন দারুল ইসলামের বাসিন্দা। ইসলাম তখন বিজয়ী সভ্যতা। ফলে তাদেরকে কিছুই লুকাতে হয়নি, কোনো কাটছাঁট করতে হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে সালাফদের কারও কারও সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যে ভুল থাকতে পারে; কিন্তু যখন তারা কোনো বিষয়ে একমত হন, সেখানে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইমাম সাফফারিনি রহ. বলেন, 'সালাফের মাজহাব বলতে বোঝায় সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িনদের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের অবস্থান, যাদের উচ্চ মর্যাদা ও ইলমি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ তাদের কথা সংরক্ষণ করে পূর্বসূরিদের কাছ থেকে উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।'[১]

আধুনিকতাবাদীদের কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, আগেকার কিতাবাদি তো 'ফাহমুস সালাফ' বা 'মানহাজুস সালাফ' ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায় না; তা হলে সালাফের মানহাজ বা সালাফের ফাহমকে এতটা গুরুত্ব দেয়ার কী আছে? কথা সত্য; পূর্বের কিতাবাদিতে সরাসরি 'ফাহমুস সালাফ' বা 'মানহাজুস

---

১. *লাওয়ামিউল আনোয়ার*, ১/২০

সালাফ' শব্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু এই বিষয়টি তারা বিবৃত করেছেন ভিন্ন ভিন্ন শব্দে—যেমন: 'মা আলাইহিস সাহাবাহ', 'মা আমিলা বিহিস সালাফ' কিংবা 'মা কলাহু আইম্মাতিল হুদা'। এগুলো প্রতিটিই সালাফের ইজমা প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ফলে 'সালাফের ফাহামকে আলাদা গুরুত্ব দেয়ার কিছু নাই' বলাটা মূর্খতার নামান্তর।

সালাফের সামগ্রিক অবস্থান যে অনুসরণীয়, তার দলিল ইবনে মাসউদের সেই বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেছিলেন—'আল্লাহ তাআলা বান্দাদের অন্তরের দিকে তাকান। এর মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরকে শ্রেষ্ঠ অন্তর হিসেবে পান। তাকে নবুওত দিয়ে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি নবীজির অন্তর বাদ দিয়ে অন্য বান্দাদের অন্তরের দিকে তাকান। এবার নবীজির সাহাবিদের অন্তরগুলোকে শ্রেষ্ঠ অন্তর হিসেবে পান। ফলে তাদেরকে নবীজির সোহবত ও দ্বীনের সাহায্যকারী হিসেবে নির্বাচিত করেন। ফলে মুসলমানরা যা উত্তম বিবেচনা করে, আল্লাহর কাছেও তা উত্তম; মুসলমানরা যা নিকৃষ্ট ভাবে, আল্লাহর কাছেও তা নিকৃষ্ট।'[১] ইবনে মাসউদ এখানে সাহাবিদের পৃথক পৃথক বক্তব্য বা অবস্থান নিয়ে বলেননি, বরং তাদের সামগ্রিক অবস্থান নিয়ে বলেছেন। বোঝা গেল, যে বিষয়ে তাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখান থেকে সরে আসার উপায় নেই।

ইবনে আব্বাস রা. খারেজিদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের কাছে এসেছি নবীজির সাহাবিদের কাছ থেকে। তাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা এর ব্যাখ্যা তোমাদের চেয়ে ভালো জানতেন।'[২]

ইমাম আওজায়ি রহ. বলেন, 'নিজেকে সুন্নাহর পথে অটল রাখো। সালাফে সালেহিনের পথ অনুসরণ করো। তারা যা বলেছেন, তা বলো; যা থেকে চুপ ছিলেন, তাতে নীরবতা অবলম্বন করো।'[৩]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, 'আমাদের কাছে উসুলুস সুন্নাহ হল, নবীজির সাহাবিদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা এবং তাদের অনুসরণ করা।[৪]

---

১. *মুসনাদে তায়ালিসি*, ২৪৩

২. *নাসায়ি*, ৮৫২২

৩. *আশ-শরিয়াহ*, ২৯৪

৪. *উসুলুস সুন্নাহ*, ১৪

ইবনে কুদামা রহ. বলেন, 'কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার অনুসরণ করা যে ওয়াজিব, তা প্রমাণিত।'[১]

যারা সালাফের মানহাজ ও ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরে, তারা বিকৃতি থেকে রক্ষা পায়। অপর দিকে যারা সালাফের মতাদর্শ থেকে সরে নিজেরা কিছু করতে চায়, তারা প্রায়ই নিজে বিভ্রান্ত হয়, অন্যের জন্যও বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়।

গ. সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আপত্তি ও সংশয়

সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়নিষ্ঠতার বিষয়টি আহলুস সুন্নাহর কাছে সর্বস্বীকৃত। এ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতেই অসংখ্য দলিল বিদ্যমান। ইসলামি শরিয়ায় যে কয়েকটি বিষয়ে আলেমদের ইজমা রয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম হল সাহাবিদের ন্যায়নিষ্ঠতার বিষয়টি। এখানে সংক্ষেপে আলেমদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল।

ইবনে আবদুল বার আন্দালুসি বলেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সকল হকপন্থি মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে, সকল সাহাবিই ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ।'[২]

এই ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন ইমামামুল হারামাইন জুয়াইনিও।[৩]

ইমাম গাজালি রহ. বলেন, 'উম্মতের সালাফরা সাহাবিদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে একমত। কারণ, এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমেই স্পষ্ট করেছেন। যিনি সকল গায়েবের খবর রাখেন, তার প্রশংসার চেয়ে আর কার প্রশংসা বেশি সঠিক হবে! এ বিষয়ে নবীজির বাণীও আছে। যদি এই প্রশংসাগুলো নাও থাকত, তবুও তাওয়াতুর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের হিজরত, জিহাদ, দান, ইসলামের জন্য পরিবার-পরিজন ত্যাগ ও নবীজির সাহায্য সম্পর্কিত যে সব সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেটাই যথেষ্ট তাদের আদালত প্রমাণ করতে।'[৪]

---

১. *জাম্মুত তাবিল*, ৩৫

২. *আল-ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব*, ১/৭

৩. *আল-বুরহান ফি উসুলিল ফিকহ*, ১/৬৩২

৪. *আল-মুস্তাফা*, ১/৩০৭

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'আহলুস সুন্নাহর সবাই সাহাবাদের আদালতের ব্যাপারে একমত।'[১]

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করে—আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত—যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহা সাফল্য।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

কারও নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে—তবে যে দিকে সে ফিরে যায়, সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস![৩]

মুফাসসিরদের মতে এই আয়াতে 'মুমিন' দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরাম।[৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেন—

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

---

১. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ৩০/৫৪
২. সুরা তাওবা, ১০০
৩. সুরা নিসা, ১১৫
৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন—*রুহুল মাআনি*, ৩/২০২; *মুকাদ্দিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, ৯

তারা যদি ঈমান আনয়ন করে তোমাদের ঈমানের মতো, তা হলে অবশ্যই তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।[১]

যারা সাহাবিদের উপর নানা আপত্তি করে কিংবা সংশয় ছড়াতে চায়, তারা বেশ কিছু বিষয়কে ব্যবহার করে। যেমন, কিছু হাদিস সামনে এনে বলতে চায়, এ সব হাদিসে নবীজি সা. সাহাবিদের নিন্দা করেছেন। কখনও তারা জঙ্গে-জামাল, জঙ্গে-সিফফিন তথা মুশাজারাতে সাহাবার ঘটনা টেনে সাহাবিদের ক্ষমতালোভী প্রমাণ করতে চায়। এ সব ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত দলিলগুলো বেশির ভাগই শুদ্ধ নয়। সনদ চেক করলে দেখা যায়—কথাটি জাল, হয়তো কোনো শিয়া বা অন্য ফেরকার লোক বানিয়েছে! কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, হাদিসটির বাহ্যিক অর্থ এক রকম কিন্তু মূল অর্থ অন্য রকম। বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে, এখানে নিন্দা করা হচ্ছে, কিন্তু আসলে প্রশংসা। এ সব ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা ও সালাফদের মানহাজ পর্যালোচনা করলেই মূল বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে সাহাবিদের দুয়েকটি গুনাহ বা অপরাধের কথা প্রমাণিত। কিন্তু তারা সবাই জীবিত অবস্থায় তওবা করে এ সব থেকে পবিত্র হয়েই ইন্তেকাল করেছেন। সাহাবিরা নবীদের মতো নিষ্পাপ নন, তাদের দ্বারা গুনাহ হতে পারে, কিন্তু তারা মাগফুর—অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের কোনো গুনাহের কথা টেনে তাদেরকে গালমন্দ করার সুযোগ নেই।

নবীজির যুগে জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচার করে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। নবীজি সা. তাকে শাস্তির নির্দেশ দিলে পাথর মেরে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর নবীজি সা. তার জানাজা আদায় করেন। তখন উমর রাজি. বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আপনি তার (জানাজার) সালাত আদায় করলেন, অথচ সে তো ব্যভিচার করেছিল!' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই সে এমনভাবে তওবা করেছে, যদি তা মদিনার সত্তরজন লোকের মধ্যে বণ্টিত হত, তবে তাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট হত। তুমি কি তার চেয়ে অধিক উত্তম তওবাকারী কখনও দেখেছ? সে তো নিজের জীবন আল্লাহর জন্য দিয়ে দিয়েছে।'[২]

---

১. সুরা বাকারা, ১৩৭
২. *মুসলিম*, ১৬৯৬

ঘ. ইসলামে ফৌজদারি বিধান সম্পর্কিত সংশয়

রজম-সংক্রান্ত সংশয়

বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার জিনার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হল, পাথরাঘাতে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এই বিধানটি অমুসলিম তো বটেই, এক শ্রেণির মুসলিম চিন্তকরাও অস্বীকার করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাদের প্রধান আপত্তি দুটি। এটি একটি নির্মম পাশবিক শাস্তি, যা ইসলাম-অনুমোদিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কুরআনে জিনার শাস্তি হিসাবে বেত্রাঘাতের কথা আছে, রজমের কথা নেই। সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক কালে শায়খ আবু জাহরা-সহ অনেকেই রজমের বিধানকে অস্বীকার করেছেন।

রজম অস্বীকারের দুটি দলিলই ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। প্রথমত, রজম একটি শাস্তি, পুরস্কার নয়। শাস্তিতে দয়া-মায়া করা হবে না, এটাই স্বাভাবিক। শাস্তি দেওয়া হয় অপরাধকে থামাতে এবং অন্যদের মনে ভয় ধরাতে। বিবাহিত ব্যক্তির জিনা-ব্যভিচারের মতো সমাজবিধ্বংসী একটি পাপাচারকে থামাতে কঠোরতা করা হবে, এটাই স্বাভাবিক। অপরাধের শাস্তি নির্ধারণে আল্লাহর হুকুমগুলো তার হেকমতের অংশ। তিনি ভালো জানেন, বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে সরাতে কখন, কোন স্তরের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে! এ ক্ষেত্রে আমরা নিজের পক্ষ থেকে কিছু নির্ধারণ যেমন করতে পারি না, তেমনি কিছু অস্বীকারও করতে পারি না। দ্বিতীয়ত, কুরআনের রজমের কথা না থাকলেও একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা এই শাস্তি প্রমাণিত। নবীজির যুগে বিবাহিত যারা জিনা করেছে, তাদেরকে এই শাস্তিই দেওয়া হয়েছে। ফকিহরা এ সব হাদিসের আলোকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি এই বিষয়ে আলেমদের ইজমাও সম্পন্ন হয়েছে। ইবনে আবদুল বার বলেন, 'খারেজি ও মুতাজিলাদের মতো বেদআতি ফেরকাগুলো রজমকে মানে না। তাদের এই অবস্থান নবীজির সুন্নাহর বিপরীত। নবীজি নিজে রজম করেছেন। এরপরে তার খলিফারাও করেছেন। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের আলেমরা, চাই সে আহলুর রায় হোক কিংবা আহলুল হাদিস, তারা রজমের ব্যাপারে একমত। তারাই আহলে হক।'[১]

ইবনে কুদামা মাকদিসি বলেন, 'বিবাহিত ব্যক্তির জিনার শাস্তি হল রজম করা। এটা সকল আহলে ইলমের মত। খারেজিরা ছাড়া আর কেউ এর বিরোধিতা করেনি।'[২]

---

১. *আত-তামহিদ*, ২৩/১২১
২. *আল-মুগনি*, ১২/৩০৯

ইবনে বাত্তাল বলেন, 'নবীজির বিষয়ে প্রমাণিত যে, তিনি রজমের আদেশ দিয়েছেন এবং রজম করেছেন। আলি রাজি. বলেছেন, 'আমরা নবীজির সুন্নত অনুসরণ করে রজম করেছি।' হজরত উমর রাজি.-ও রজম করেছেন। নবীজির সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদিনের আমল দ্বারা রজম প্রমাণিত। আহলে ইলমরাও এ বিষয়ে একমত। মদিনার ইমাম মালেক, সিরিয়ার ইমাম আওজায়ি, ইরাকের ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই মতই গ্রহণ করেছেন। খারেজি ও মুতাজিলারা রজমকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে রজম কুরআন-সুন্নাহয় নেই।'[১]

রিদ্দাহর শাস্তি-সংক্রান্ত বিভ্রান্তি

রজমের মতো রিদ্দাহর শাস্তি নিয়েও রয়েছে নানা বিভ্রান্তি। বিশেষ করে গত এক শতাব্দীতে মুসলিমবিশ্বে তুফানের মতো হানা দিচ্ছে ইরতিদাদ! মুসলিমরা সন্তানরা ক্রমেই নিজেদেরকে জড়িয়ে নিচ্ছে ইরতিদাদের জালে। ফলে এই সময় মুরতাদের শাস্তি নিয়েও শুরু হয়েছে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা। এক শ্রেণির গবেষকের সাফ কথা, ইসলামে মুরতাদের কোনো শাস্তি নেই! দলিল হিসাবে তারা কুরআনুল কারিমের একটি আয়াত উপস্থাপন করে—

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

দ্বীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নেই।[২]

কথা হল, কুরআনের এই আয়াত কি সালাফে সালেহিনরা জানতেন না! আলেমরা জানতেন না! যদি এই আয়াতের অর্থ এটাই হয় যে, মুরতাদকে শাস্তি দেওয়া যাবে না, তা হলে ইবনে কুদামা কেন লিখলেন, 'সকল আহলে ইলমের ইজমা হল, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'[৩] আহলে ইলমদের এই ইজমার তিনটি অর্থ হতে পারে :

- তাদের কেউই এই আয়াতের অর্থ ও মর্ম বুঝতে পারেননি।
- তারা এই আয়াতের অর্থ ও মর্ম বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু তা গোপন করেছেন। জেনে-বুঝে কুরআনের নির্দেশনার বিপরীত মত দিয়েছেন।

---

১. *শরহে ইবনে বাত্তাল*, ৮/৪৩১

২. সুরা বাকারা, ২৫৬

৩. *আল-মুগনি*, ১২/২৬৪

- তারা এই আয়াতের সঠিক অর্থ ও মর্ম জানতেন। তারা জানতেন মুরতাদকে কতল করার হাদিসের সঙ্গে এই আয়াতের কোনো বিরোধ নেই।

যার সুস্থ চিন্তাশক্তি এখনও নষ্ট হয়নি, সে স্বীকার করবে—এখানে তৃতীয় সম্ভাবনাটিই সঠিক। ইবনে জারির তাবারি রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'নবীজি সা. মুরতাদদেরকে হত্যার ফয়সালা করেছেন এবং যাদের সামনে ইসলাম উপস্থাপন করার পরেও ইসলাম গ্রহণ করেনি—তাদের ক্ষেত্রেও এই ফয়সালা করেছেন। অপর দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু জিজিয়া দিতে সম্মত হয়েছে—তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, এই আয়াতটির মর্ম হল—যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, কিন্তু জিজিয়া দিতে সম্মত হবে—তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে, জোরজবরদস্তি করা হবে না।'[১]

ইবনে কাসির বলেন, 'আলেমদের বড় অংশের বক্তব্য হল, এখানে উদ্দেশ্য আহলে কিতাব।'[২]

বর্তমান সময় নাস্তিক, মুরতাদ ও সেক্যুলারদের আপত্তির বড় একটি জায়গা হল—মুরতাদের শাস্তি। তাদের মতে এটি মানবতাবিরোধী কাজ। তাদের এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুসলিম চিন্তকদের অনেকে আবার মুরতাদের শাস্তির বিষয়টিই অস্বীকার করে বসেছেন! বলা বাহুল্য, এই অস্বীকারের পুরো প্রবণতাই সাম্প্রতিক। আধুনিক কালের আগে মুসলমানদের মধ্যে মুরতাদের শাস্তি নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার নানা প্রভাবশালী মতবাদ, বিশেষ করে হিউম্যান রাইটস ইত্যাদির সংজ্ঞায়নের কারণে মুসলমানরাও এখন মানবাধিকারের পশ্চিমা বক্তব্যই মেনে নিচ্ছে। যেখানে ধর্মীয় কারণে হত্যাকাণ্ড মানেই খারাপ বিষয়! পশ্চিমা এই মতবাদগুলোর প্রভাবে মুসলমানরা প্রায়ই এমন কিছুকে অস্বীকার করে বসছে, যা নুসুসে শরিয়া দ্বারাই প্রমাণিত! পূর্ববর্তী আলেমদেরকে এই সমস্যায় পড়তে হয়নি। কারণ, তারা বসবাস করতেন দারুল ইসলামে, যেখানে ইসলাম ছিল বিজয়ী।

মুরতাদের শাস্তির বিষয়ে আলেমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে এ সংক্রান্ত দুটি হাদিস দেখা যাক :

---

১. *তাফসিরে তাবারি*, ৪/৫৫৪

২. *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ১/৬৮৭

- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ধর্ম ত্যাগ করে, তাকে হত্যা করো।'[১]

- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল'—নিম্নোক্ত তিনটি কারণের কোনো একটি ছাড়া তার রক্তপাত করা হারাম: হত্যার বদলে হত্যা, বিবাহিত ব্যভিচারী, দল থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মত্যাগী।'[২]

---

১. *বুখারি*, ২৭৯৪। এখানে ধর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম।

২. *বুখারি*, ৬৮৭৮; *মুসলিম*, ১৬৭৬

মুসলিম মডার্নিজম : ধরন ও প্রকৃতি

পশ্চিমা নানা মতবাদ ও চিন্তার প্রভাবে গত দেড় শতাব্দী ধরে মুসলিমবিশ্বে গড়ে উঠেছে মডার্নিস্টদের একটি ধারা। যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে ইসলামের নানা বিধিবিধান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এই মডার্নিস্টরা খুবই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করে এবং বিপরীত সকল চিন্তাধারা ও পর্যালোচনাকে সেকেলে ও অচল ঘোষণা দেয়।

মুসলিম মডার্নিজমের মূল কথা হল, ইজমাকে অস্বীকার করা। ইসলামি জ্ঞানচর্চার পুরো ধারার বিপরীতে গিয়ে মুসলিম মডার্নিজম ঘোষণা করে, আজ পর্যন্ত কেউই ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি! মডার্নিস্টদের দৃষ্টিতে উম্মাহর ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসিররা ছিলেন ভাসা ভাসা আক্ষরিক জ্ঞানের অধিকারী, নিজ সময় ও অঞ্চলের বাইরে চিন্তা করতে ব্যর্থ, অনারব কিংবা উমাইয়া-আব্বাসিদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তারা জ্ঞানশাস্ত্রের নানা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, অযথা কঠোরতা করেছেন, যা ইসলামের মেজাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এভাবে সালাফে সালেহিনের সকল ব্যাখ্যা ও মতামত তুড়ি মেরে উড়িয়ে তারা নিজেরা নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে, যা সাধারণত পশ্চিমের ইসলামায়ন কিংবা ইসলামের পশ্চিমায়ন করে।

আধুনিক সময়ে যারা কথায় কথায় ধর্মীয় চিন্তার বিনির্মাণ ও কাঠামোগত সংস্কারের কথা বলেন, তাদেরকে মোটা দাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১। প্রথম দলের কাজ হল, পশ্চিমা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তালাশ করা। এই চিন্তাধারার লোকেরা ইসলামের ইতিহাস ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একেবারে অস্বীকার করে না; কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত সকল পশ্চিমা দর্শনকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেয়। তারা কখনও বলে— বিজ্ঞান তো মুসলমানদের হাতেই উন্নতি লাভ করেছে, এটি মুসলমানদের হারানো মিরাস! আবার কখনও বলে—মাল্টি কালচারালিজম তো মাদানি

জিন্দেগিতেই ছিল! কখনও বলে বসে—ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রচলিত ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা!

এরা মুতাজিলাদেরকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে উপস্থাপন করে, এমনকি এদের মতে গণতন্ত্রও ইসলামেরই একটি অংশ! এক কথায়, বর্তমান সময়ে প্রচলিত সকল জাহেলি দর্শনকে তারা টেনেটুনে কোনো-না-কোনোভাবে 'ইসলামিক' বানিয়ে দেয়! এই শ্রেণিকে আমরা Revisionist-শ্রেণি বলতে পারি। তাদের সকল কাজের লক্ষ্য একটাই—Islamization of west.

জাহেদ সিদ্দিক মুঘল বলেন, 'এই শ্রেণির লোকজন নিজেদের খুশিমতো ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যে একটি ব্রিজ নির্মাণ করেন, কিন্তু এই ব্রিজে শুধু একমুখী চলাচলই করা যায়! আজ পর্যন্ত এই ব্রিজ দিয়ে শুধু পশ্চিমা চিন্তাধারাগুলোই মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিন্তু ইসলামের কিছু পশ্চিমে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। উপমহাদেশে এই ধারার সূচনা হয়েছে কবি ইকবালের হাত ধরে।'[১]

২। এরা আরেক শ্রেণি, যাদের বক্তব্য হল—আজ পর্যন্ত কেউই ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। আমিই সেই ব্যক্তি, যে ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে বুঝেছি। সুতরাং চৌদ্দশ বছরে উম্মাহর উলামাদের সকল ইজমা ফেলে দাও, আমার কথাই গ্রহণ করো।

এই শ্রেণির আরেকটি দাবি হল—আসলাফরা তাদের যুগ অনুযায়ী, তাদের সমাজ অনুযায়ী ইসলামকে ব্যাখ্যা করেছেন। এখন যেহেতু স্থান ও কাল বদলে গেছে, তাই আমাদের উচিত নিজেদের যুগ ও সমাজ অনুযায়ী ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা। কারণ, পুরনো ব্যাখ্যাগুলো আমলযোগ্য না।

উপমহাদেশে এই ধরনের চিন্তার প্রবর্তক হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। এই মতটি গোমরাহির নানা চেহারায় সমাজে প্রকাশ পায়। এই শ্রেণিটি

---

১. প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, কবি ইকবালকে এই অঞ্চলে একপাক্ষিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিনা প্রশ্নেই তার চিন্তাধারার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাকে একজন কবি হিসেবে বিবেচনা করে তার কাব্য-সংক্রান্ত পর্যালোচনাই করা হয়েছে বেশি। কিন্তু তার চিন্তাগত বিচ্যুতি নিয়ে কাজ করা হয়নি। *The Reconstruction Of Religious Thought In Islam* গ্রন্থে ইকবালের যে ফিকহি গোমরাহি ধরা পড়েছে, তা পর্যালোচনা না করায় তার সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়নি। এ বিষয়ে চমৎকার পর্যালোচনা করেছেন বুস্তামি মুহাম্মদ সাইদ তার গ্রন্থ *মাফহুমু তাজদিদিদ দ্বীনে*। ইকবালের বিভ্রান্তির চমৎকার খণ্ডন করেছেন মরিয়ম জামিলাও। বিস্তারিত জানতে দেখুন—তার রচিত *Islam In Theory And Practice*.

গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ না জেনেই একে ইসলামের প্রকৃত ও একমাত্র শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করে দেয়। এরা কখনও রাজতন্ত্রকে সকল সমস্যার সূত্র মনে করে; আবার কখনও খেলাফতকে গণতন্ত্রের শাসন বলে মর্যাদা দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের উপর কটাক্ষের তীর ছুড়ে দেয়! তাদের কাছে দলিলেরও অভাব নেই! কুরআনের আয়াত ও হাদিসগুলোকে একের পর এক তাবিল করে তারা নিজেদের মতো সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। আসলে এমন তাবিল করলে গণতন্ত্র কেন, সব কিছুই কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণ করা যাবে। এই ব্যক্তিরা ডারউইনের মতবাদ, পৃথিবীর সূচনা-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদ, মার্কসিজম, ক্যাপিটালিজম, লিবারেলিজম—এমনকি হিউম্যান রাইটসকেও কুরআন থেকে প্রমাণিত করে দেখায়! নাউজুবিল্লাহ! বর্তমানে এই চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি হলেন জাভেদ আহমদ গামেদি। এই চিন্তাধারার লোকদের উদ্দেশ্য হল—Westernization of islam.

৩। আধুনিকতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকাশ ঘটেছে সেক্যুলারিজমের চেহারায়। এই মতবাদ অনুসারে ধর্ম একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত বিষয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এর কোনো অবস্থান নেই। এই মতবাদ অনুসারে হিউম্যান রাইটস ও গণতন্ত্রের মেলবন্ধন দেখানো হয়। এই মতবাদের অনুসারীরা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া জন্য গণতন্ত্রের মতো শয়তানি জীবনদর্শনকেও ইসলামি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মোড়কে উপস্থাপন করে দেখায়। বাস্তবে ধর্মের প্রতি এই মতবাদের প্রবক্তাদের কোনো আগ্রহ নেই। বর্তমানে মাহদি হাসান, ড. মানজুর আহমদ, ড. মোবারক আলি, ড. জাভেদ ইকবাল এবং তাদের সাথিরা নিয়মিত টিভি প্রোগ্রামে এসে এই মতবাদ প্রচার করছে।

এই তিনটি শ্রেণিই একে-অপরের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে। এদের সবার উদ্দেশ্য একটাই—আকলকে ওহির চাইতে প্রাধান্য দেওয়া কিংবা অন্তত ওহির সমতুল্য মনে করা! উম্মতে মুসলিমার পুরো ইতিহাসে মুতাজিলা ছাড়া আর কারও মধ্যে এই চিন্তার অস্তিত্ব ছিল না।

এই সংস্কারকামীদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু কমন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

১। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই কথা প্রচার করা হয়, যে কেউই কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারে! এর জন্য কোনো শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের দরকার নেই।

২। কোনো-না-কোনো অবস্থায় হাদিসের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করা কিংবা এর শরয়ি অবস্থান খাটো করা। এদের সকল জোর থাকে কুরআনের দিকেই।

৩। সালাফদের উপর নানা অভিযোগ ও বিদ্রুপের তীর নিক্ষেপ করা, উম্মাহর ইজমা অস্বীকার করা, এমনকি সাহাবিদের আমলকেও এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা রাখা।

৪। জনগণের মধ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করা। (মুতাজিলাদের ইতিহাসও তা-ই বলে। তারাও আব্বাসি খলিফা মামুন ও মুতাসিম বিল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের মতবাদ ছড়াচ্ছিল। বর্তমানে পাকিস্তানে যারা এ সব মতবাদ ফেরি করে বেড়াচ্ছে, তাদের অবস্থাও অনুরূপ।)

৫। ইসলামের নানা দর্শন ও চিন্তার উপর সুন্দর সুন্দর আলোচনা উপস্থাপন করতে এরা খুব আগ্রহী থাকে। কিন্তু শরিয়ার দায়েমি আহকাম মেনে চলা, ইশকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাকওয়া, পরহেজগারিতা ইত্যাদি বিষয় থেকে এদের অবস্থান হয় ক্রোশ ক্রোশ দূরে!

যেহেতু এই তিনটি ধারাই ইসলামের ইলমি সিলসিলা ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে, এ জন্য তাদের কাছে ইসলামের পুনর্জাগরণের কোনো সুচিন্তিত কর্মপন্থা নেই। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যগুলো ধোঁয়াশাপূর্ণ, অস্পষ্ট ও হেঁয়ালিতে ভরপুর। বেশির ভাগ সময় তারা মূলত পশ্চিমা নানা বিষয়ের উপর ইসলামের সিল মেরে কাজ চালাতে চায়। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম যিনি পশ্চিমা মতবাদগুলোকে একটি জীবনব্যবস্থা আকারে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং এগুলোকে প্রত্যাখ্যানের পক্ষে লেখালেখি করেছেন—তিনি হলেন আবুল আলা মওদুদি। পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীতে তার করা ক্রিটিকগুলো সত্যিই অসাধারণ! যদিও তিনি নিজেও কিছু বিষয়ে মডার্নিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষ করে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট।

এই শ্রেণির লোকদের দর্শন মেনে নেওয়ার আবশ্যক ফলাফল হচ্ছে এই কথা মেনে নেওয়া যে, চৌদ্দশ বছর ধরে এই উম্মাহ শরিয়াকে এমনভাবে পালন করেছে, যা সঠিক ছিল না। বরং সঠিক ছিল এর উল্টোটা এবং সেটিই পালন করা তাদের উচিত ছিল। একই সঙ্গে এটাও চলে আসে—উম্মাহর মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহরা ভুল করে গেছেন! তাদের কারণেই উম্মাহ এক

আজিমুশ শান দ্বীনি কাজ করা থেকে বঞ্চিত ছিল। আল্লাহ রহম করুক এই উম্মাহর ফকিহদের উপর! তারা কোনো বহিরাগত মতবাদে প্রভাবিত না হয়েই ফিকহে ইসলামির সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করছেন, যা দেখে এখনও গর্বে মাথা উঁচু হয়ে যায়!

আধুনিকবাদী এই শ্রেণি যখন দেখে, সালাফরা বাতিল দর্শনের সঙ্গে আপস করেননি—তখন তারা নিজেদের সংশোধনের পরিবর্তে সালাফদের ব্যাপারে জবান খুলে বসে! কখনও বলা হয়—ফিকহের এই সুবিশাল ভাণ্ডার গ্রিক ও রোমানদের থেকে নেওয়া! কখনও বলা হয়—ফিকহের জন্ম হয়েছে রাজতন্ত্রের ছায়ায়! এতেও মন না ভরলে তারা বলে বসে—অনারবদের চক্রান্তে ইসলামের প্রকৃত চেহারাই আড়াল হয়ে গেছে! নাউজুবিল্লাহ! তাদের এই কথার পক্ষে কোনো আকলি বা নকলি দলিল নেই। এখান-ওখান থেকে নিয়ে-আসা বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনাকে নিজের মতো করে ভেঙেচুরে একটা ফলাফল বের করে বসে তারা!

প্রকৃতপক্ষে এই তিন দলই সেই পথ থেকে সরে গেছে, যার উপর সালাফদের ইজমা ছিল এবং আজও হক্কানি উলামাগণ যে পথ মজবুত করে আঁকড়ে ধরে আছেন। মডার্নিস্টরা যদিও সালাফদের উপর আপত্তি করে বলে—অনেক সময় তারা সমকালীন রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন; কিন্তু বাস্তবতা হল, মডার্নিস্টরা নিজেরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত! সালাফদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ রাজদরবারে যাতায়াত করেছেন, অনেক সময় শাসকদের অনুকূলে ফতোয়াও দিয়েছেন, এটা যেমন সত্য—এর চেয়ে বড় সত্য হল, সালাফরা সামগ্রিকভাবে কখনওই এ সব অবস্থান মেনে নেননি, বরং এর বিরোধিতা করেছেন। ফলত যে সব বিষয়ে সালাফদের মধ্যে ইজমা হয়েছে, সেখানে এমন প্রভাবিত সিদ্ধান্ত প্রবেশ করতে পারেনি। উপরন্তু, তাদের সময়ে ইসলাম ছিল বিজয়ী। তারা ইসলামের ভূমিতেই বসবাস করছিলেন। যে কোনো বিষয়ে শরিয়ার সিদ্ধান্ত জানাতে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা ছিল না। কারও দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত হতে হয়নি। হুদুদ, কিসাস, রজম, মুরতাদের শাস্তি, দারুল ইসলাম, দারুল কুফর, জিহাদ—প্রতিটি বিষয় তারা দ্বিধাহীন আলোচনা করেছেন। অপর দিকে আধুনিক গবেষকরা প্রতিনিয়ত সাম্রাজ্যবাদ, মডার্নিজম, পশ্চিমা সভ্যতা, সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হন। এই প্রভাবের কারণেই তারা নিয়মিত শরিয়াকে

কাটাছেঁড়া করেন, বিধিবিধানকে বিকৃত করেন। কখনও হুদুদ অস্বীকার করেন, কখনও শাতেমে রাসুলের শাস্তি অস্বীকার করেন। অর্থাৎ সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা মডার্নিস্টরাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত এবং তাদের এই অবস্থার কারণেই তারা শরিয়ার বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন হল, মুসলিম মডার্নিজমের উৎপত্তি কোথায়? ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, মডার্নিজমের ধ্বজাধারীরা মূলত ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ দ্বারা প্রভাবিত। রেনেসাঁর পর থেকে পশ্চিমে যে সকল নিত্যনতুন মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, এগুলোকে তারা অকাট্য হিসাবেই গ্রহণ করে ফেলে। রেনেসাঁর মাধ্যমে এক দিকে ইউরোপ আধুনিক দুনিয়ার প্রবেশ করে, অপর দিকে তা খ্রিষ্টজগতের মূল ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়। ধর্মের সঙ্গে আধুনিক মতবাদ ও চিন্তাধারার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং এই লড়াইয়ে খ্রিষ্টধর্ম শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। গির্জার একক আধিপত্য থেকে মুক্ত হয় ইউরোপ। মুসলিম মডার্নিস্টরা যখন রেনেসাঁর ইতিহাস পর্যালোচনা করেন, তখন তারা প্রায়ই একটি ভুল করে বসেন! তারা পুরো বিষয়টিকে রেনেসাঁ বনাম খ্রিষ্টধর্মের সংঘাত হিসাবে বিবেচনা করেন, অথচ বিষয়টি ছিল রেনেসাঁ বনাম ধর্মের সংঘাত। যদি সে সময় ইউরোপে খ্রিষ্টধর্মের পরিবর্তে অন্য কোনো ধর্ম থাকত, তা হলে রেনেসাঁর সঙ্গে সেই ধর্মের সংঘাত হত। মুসলিম মডার্নিস্টরা যখন রেনেসাঁর আলোচনা করেন, তখন তারা মোটা দাগে দুটি ভুল করেন :

১। খ্রিষ্টধর্ম যেহেতু নানাভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, এ জন্য এটি রেনেসাঁর মোকাবেলা করতে পারেনি। রেনেসাঁর ফলে উদ্ভূত চিন্তাধারাগুলোর যৌক্তিক জবাব দিতে না পারায় খ্রিষ্টধর্মের পতন হয়েছে।

২। রেনেসাঁর মূল নায়ক আসলে মুসলমানরাই। স্পেনের মুসলমানদের কাছ থেকেই ইউরোপিয়ানরা চিন্তার এই উৎকর্ষতা অর্জন করেছে। ফলে রেনেসাঁর সঙ্গে ইসলামের দূরত্ব আসলে খুব কম।

এই দুই সিদ্ধান্তের ফলাফল হচ্ছে, ইসলাম যেহেতু বিকৃত হয়নি এবং এটি সকল প্রশ্নের যৌক্তিক সমাধান দিতে সক্ষম, ফলে রেনেসাঁর সঙ্গে এর কোনো সংঘাত নেই—উল্টো ইসলাম ও রেনেসাঁর ডিসকোর্সগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে সামনে এগোতে সক্ষম! মূলত এই চিন্তা থেকেই ইসলামিক মডার্নিজমের সূচনা।

সমস্যা হল, তাদের এই দুটি সিদ্ধান্তই ভুল। কারণ, রেনেসাঁর ডিসকোর্সগুলো শুধু খ্রিষ্টধর্মকেই নাকচ করে না, বরং এটি সকল ধর্মকেই নাকচ করে। রেনেসাঁর সকল ডিসকোর্সেই স্রষ্টা বা প্রভুর ধারণা নাকচ করে মানুষকেই খোদার আসনে বসানো হয়েছে। মানুষের সকল স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকেই করা হয়েছে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। এটি ঠিক যে, খ্রিষ্টধর্ম তার আবেদন ও রুহানিয়াত হারিয়ে ফেলেছিল, রেনেসাঁর সামনে তার পরাজিত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা—কিন্তু এর মানে এই নয় যে, রেনেসাঁর ডিসকোর্সগুলো সঠিক। দুইশ বছর আগে খ্রিষ্টজগৎ যে রেনেসাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল, সেই রেনেসাঁ আজ ইসলামের মুখোমুখি। রেনেসাঁর ডিসকোর্সগুলো একে একে আঁকড়ে ধরছে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস। লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম, হিউম্যান রাইটস—প্রতিটি বিষয় মুসলমানদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে এক বিরাট প্রশ্ন নিয়ে। ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে, তাওহিদ ও শিরক যেমন এক হতে পারে না—তেমনি ইসলাম ও রেনেসাঁর ডিসকোর্সগুলোও এক হতে পারে না। একটি-না-একটিকে অবশ্যই পরাজিত হতে হবে।

মুসলিম মডার্নিস্টদের বক্তব্য ও চিন্তা দ্বারা কারা প্রভাবিত হয়? পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মোটা দাগে তিন শ্রেণির মানুষ এর শিকার হয় :

১. আলেমবিদ্বেষ: এই শ্রেণির লোকদের মূল সমস্যা হল, আলেমবিদ্বেষ। তারা মনে করে, আলেম-সমাজ ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও বিধিবিধানকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। এই শ্রেণিটি মডার্নিস্টদের দ্বারা শুধু এই কারণেই প্রভাবিত হয় যে, এরা ট্র্যাডিশনাল আলেম না। সাধারণত আকিদা ও ফিকহ সম্পর্কে এদের সীমাহীন অজ্ঞতা থাকে। তবুও মডার্নিস্টদের প্রতিটি কথাকেই তারা চূড়ান্ত মেনে নেয়। যে কোনো বিষয় সামনে এলে তাদের প্রশ্ন হল, কোনো আলেম এ কথা বলেছে কি না! উত্তর 'হ্যাঁ' হলে তাদের সংশয়-সন্দেহ প্রকাশ পায়। উত্তর নেতিবাচক হলে দ্রুত তারা বিষয়টি লুফে নেয় এবং আপন করে ফেলে। এই আলেমবিদ্বেষের পিছনে নানা কারণ থাকতে পারে। সমাজের চোখে নিজেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন, পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা তীব্রভাবে প্রভাবিত হওয়া কিংবা পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বকে চূড়ান্ত মনে করা।

২. পশ্চিমা প্রেম: এই শ্রেণির লোকজন অন্তরে তীব্র পশ্চিমা প্রেম লালন করে। এরা সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে—যদি কেউ তাদেরকে পশ্চিমের সবগুলো বিষয় ইসলামের মোড়কে উপস্থিত করে দেয়, তা হলে

সেই বিষয়গুলো গ্রহণ করতে আর অপরাধবোধ থাকবে না, ইসলামের নাম দিয়েই গ্রহণ করা যাবে! যেহেতু ট্র্যাডিশনাল আলেমদের কথা মেনে নিলে এমন সুযোগ নেই, ফলে তারা মডার্নিস্টদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। এই শ্রেণিটি এক দিকে পশ্চিমের সঙ্গে তাল মেলাতে চায়—অপর দিকে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও প্রস্তুত নয়! ফলে মডার্নিস্টদেরকে তারা গ্রহণ করে আশার আলোরূপে। এই শ্রেণির মূল প্রশ্ন হল—আধুনিক সভ্যতার সব কিছু গ্রহণ করতে চাই। ইসলামে কি এর ব্যবস্থা আছে?

৩. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব নিরসন: আরেকটি শ্রেণি আছে। এদের উদ্দেশ্য মহৎ। তারা চায়, ইসলামের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব নিরসন করতে কিংবা ইসলামকে বিজয়ী করতে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় এদের ধর্মীয় পড়াশোনার পরিধি হয় সীমিত। আকিদা ও ফিকহের গভীর জ্ঞান থাকে না। কখনও পশ্চিমা মতবাদগুলো সম্পর্কে পড়াশোনার স্বল্পতা দেখা যায়। ফলে তারা পুরো বিষয়টি তালগোল পাকিয়ে ফেলে! কখনও পশ্চিমা বিষয়গুলোকে ইসলামের ধারা বলে স্বীকৃতি দেয়। আবার কখনও ইসলামের বিধানগুলোর পশ্চিমা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। আগের দুই শ্রেণির চেয়ে এই শ্রেণিটি অনেক বেশি ক্ষতিকর হয় ইসলামের জন্য।

মডার্নিস্টরা আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বিভ্রান্ত ফেরকার একটি। চিন্তার দিক থেকে এরা স্থবির; নিজের কাঠামোর বাইরে অন্য কিছুই শুনতে প্রস্তুত নয় তারা। বাহ্যিকভাবে তারা গবেষণার ভান ধরে, কিন্তু সেই গবেষণা সব সময় ওরিয়েন্টালিস্টদের দেখানো পথেই আবর্তিত হয়। তবে নিজেদের ব্যাপারে মডার্নিস্ট শব্দ প্রয়োগে তাদের বেশ আপত্তি!

স্যার সৈয়দ হোক কিংবা সাম্প্রতিক কালে জাভেদ আহমদ গামেদি হোক, তাদের সবার বক্তব্য একই—তারা দ্বীনের সীমানা অতিক্রম করে কিছু করছে না, বরং সঠিকভাবে দ্বীন বোঝার চেষ্টা করছে মাত্র! তাদের আবিষ্কৃত নিত্যনতুন চিন্তাধারার উপর আপত্তি করা হলে তারা জবাব দেয়—সালাফদের সঙ্গে দ্বিমত করা তো দূষণীয় কিছু নয়! এরপর তারা নিজেদের সপক্ষে সালাফদের পারস্পরিক মতবিরোধের দলিলগুলো উপস্থাপন করে। তারা প্রায়ই বলে, ‘দেখুন, আবু হানিফার সঙ্গে ইমাম মালেক ইখতেলাফ করেছেন, ইমাম শাফেয়ির সঙ্গে তার ছাত্ররা মতবিরোধ করেছেন—তার মানে বিষয়গুলো অকাট্য নয়। এখানে ইজতিহাদ ও ইখতিলাফের সুযোগ আছে এবং এটিই

ইসলামের সৌন্দর্য।' এ সব বলে তারা প্রমাণ করতে চায়, ট্র্যাডিশনাল ধারার সঙ্গে তাদের যে পার্থক্য, তা মূলত সালাফদের যুগ থেকেই চলে আসছে। সেখানেও তাদের মধ্যে একাধিক ধারা বিদ্যমান ছিল।

তাদের এই জবাবটি বিভ্রান্তিকর। কারণ, মডার্নিস্টদেরকে কখনওই শুধু সালাফদের সঙ্গে দ্বিমত করার কারণে মডার্নিস্ট বলা হয় না। বরং তাদেরকে মডার্নিস্ট বলা হয় তাদের চিন্তাধারা এক বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গড়ে ওঠার কারণে। সেই উদ্দেশ্য হল, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামকে সহজ ও যুক্তিগ্রাহ্য করে উপস্থাপন। প্রশ্ন হল, বর্তমান প্রেক্ষাপট বলতে আসলে কী বোঝায়? কোন কোন চিন্তাধারার সামনে ইসলামকে নতুন করে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হচ্ছে? একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, তারা আসলে মডার্নিজমের সামনে ইসলামকে নতুন করে উপস্থাপন করতে আগ্রহী। মডার্নিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—এটি জ্ঞানতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারকে অগ্রাহ্য করে। মুসলিম চিন্তাবিদরা যখন মডার্নিজমের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যান, তখন তারাও এই সমস্যার মুখোমুখি হন। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তারাও ইসলামের মুতাওয়ারাস ধারাকে অস্বীকার করে বসেন, সালাফদের বুঝ ও ফাহমের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নতুন একটি ধারা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। এই চিন্তকদেরকে এ জন্যই মডার্নিস্ট বলা হয়, তারা ইসলামকে মডার্নিজমের ধারা অনুসারে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। মডার্নিজমের মতোই মডার্নিস্টরাও ইসলামের ইতিহাসে একটি নতুন ফেনোমেনা। যদি মিল খোঁজা হয়, তা হলে মডার্নিস্টদের কর্মপন্থার সঙ্গে সালাফদের মানহাজের কোনো মিল নেই, বরং মুতাজিলাদের সঙ্গে তাদের বেশি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মুতাজিলারা যেমন গ্রিক দর্শন অনুসারে শরিয়াকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল, মডার্নিস্টরাও মডার্নিজম সামনে রেখে সেই কাজ করছে!

মডার্নিস্টদের দাবি হল—তারা ইসলামের পশ্চিমায়ন কিংবা পশ্চিমের ইসলামায়ন করছে না, তারা সকল প্রভাবমুক্ত হয়ে ইসলামি শরিয়ার মূল ভাষ্যটি অনুধাবন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কখনও কখনও তাদের গবেষণার ফলাফল সালাফদের মানহাজের বিপরীতে পশ্চিমা চিন্তার সঙ্গে মিলে যায়—এটাই তাদের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় প্রমাণ! মডার্নিস্টদের দাবিমতে, তাদের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত পশ্চিমা মতবাদের সঙ্গে মিলে যাওয়া একটি কাকতালীয় ঘটনামাত্র; এখানে তাদের ইচ্ছার কোনো প্রভাব নেই। গবেষণার

ক্ষেত্রে তারা শত ভাগ প্রভাবমুক্ত। কথাগুলো শুনতে ভালোই লাগে! কিন্তু মডার্নিস্টদের দেড়শ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের সব সিদ্ধান্তই কী করে যেন সালাফদের মানহাজের বিপরীতে মডার্নিজমের ধারাগুলোর সঙ্গেই বেশি মেলে! উনবিংশ শতাব্দীর মডার্নিস্ট হোক কিংবা বিংশ শতাব্দীর মডার্নিস্ট, আরবের হোক বা ভারতবর্ষের—সবার সিদ্ধান্ত কীভাবে সালাফদের মানহাজ ত্যাগ করে মডার্নিজমের দিকে ঝুঁকে যায়, তা এক প্রশ্ন বটে! দেড়শ বছর ধরে মডার্নিস্টদের সবার সিদ্ধান্ত সালাফের মানহাজ ত্যাগ করে পশ্চিমা মতবাদের দিকে ঝুঁকে যাওয়া অবশ্যই কোনো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। যে দর্শনকে সামনে রেখে তারা ইসলাম অধ্যয়ন শুরু করে, তার ফলাফল এমন না হয়ে উপায় নেই আসলে। আর এটাই আসল কথা!

সব মডার্নিস্টই বলে—আমি প্রকৃত ইসলাম অনুধাবনের চেষ্টা চালাচ্ছি, কুরআন সামনে রেখে গবেষণা করছি, আমি পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত নই; কিন্তু বাস্তবতা হল, মুসলিমবিশ্বে তাদের মতো পশ্চিমাপ্রভাবিত লোক খুব কমই আছে! তারা অনেক সময় বলে, সালাফরাও আমাদের মতো মানুষ ছিলেন, তাদেরও ভুল-ত্রুটি হত। তারা নিজেদের সমাজ ও সময় অনুসারে ওহির বাণী বোঝার চেষ্টা করেছিলেন—এতে কখনও সফল হয়েছেন, কখনও ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের কাছে শত ভাগ সঠিক ফলাফল আশা করা ঠিক নয়। এখন আমাদের উচিত নিজ সময় ও কাল অনুসারে ওহিকে বোঝার চেষ্টা করা। এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রধানত তারা সালাফে সালেহিনের ইলমি শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে ফেলে এবং তাদের ইজতিহাদ ও ফয়সালাকে তাদের সময়কাল অনুসারে প্রভাবিত বলে ঘোষণা দেয়, যা মারাত্মক গোমরাহি। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকিহরা যদি নিজ সময় দ্বারা প্রভাবিত হতেন—তা হলে কখনও তারা ইউনানি বিদ্যার আলোকে ফতোয়া দিতেন, কখনও গ্রিক দর্শনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতেন কিংবা কখনও সমকালীন রাজনীতির আলোকে শরিয়াকে ব্যাখ্যা করতেন; কিন্তু তারা কখনও এমনটা করেননি।

সাহাবিরা ছিলেন সরাসরি নবীজির ছাত্র, কুরআনের সম্বোধনের প্রথম পাত্রও ছিলেন তারাই। নবীজির কাছে তারা শিখেছিলেন শরিয়ার নানা ব্যাখ্যা, পরে যা শিখিয়েছেন তাদের ছাত্র তাবেয়িদেরকে। এভাবে ইলমের এক

নিরবচ্ছিন্ন সিলসিলা চলে এসেছে মুসলমানদের মধ্যে; ইচ্ছা করলেই যাকে অস্বীকার করা যায় না, আঘাত করা যায় না কিংবা দুর্বল বলা যায় না। মডার্নিস্টরা নিজেদের অবস্থান ঘোষণার সময় এই বিষয়টি লক্ষ রাখতে ভুলে যায়। দ্বিতীয় বিষয় হল, যেই পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে শরিয়া ব্যাখ্যার কথা বলা হচ্ছে, এই পরিস্থিতি কেন হল? এটি কি প্রকৃতিগত পরিবর্তন নাকি আরোপিত? যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মূল স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হবে না, ততক্ষণ আসলে বছর বছর ইসলামের ব্যাখ্যা বদলানো ছাড়া মডার্নিস্টদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা থাকবেও না!

গত এক শতাব্দীতে মুসলিমবিশ্বে যে সব প্রভাবশালী মডার্নিস্টের আবির্ভাব হয়েছে—তাদের মধ্যে ড. ইকবাল, মুহাম্মদ ইমারাহ ও মুহাম্মদ আসাদ অন্যতম। এদের হাত ধরে নানাভাবে শরিয়া বিকৃত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে যারা এই ধারায় কাজ করেছেন, তারাও তাদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। এখানে কয়েকজন প্রভাবশালী মডার্নিস্টের কিছু বিচ্যুতি আলোচনা করা হচ্ছে, যেন এই ধারাটি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

ড. ইকবাল

আল্লামা ইকবাল নামে পরিচিত এই কবি উপমহাদেশ তো বটেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বেশ পরিচিত। উর্দু ও ফার্সি ভাষার সুপরিচিত এই কবির শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়েছিল স্কটিশ মিশনারি স্কুল থেকে। যৌবন কালেই তিনি টমাস আর্নল্ড দ্বারা তীব্র প্রভাবিত হন এবং উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে ইউরোপ গমন করেন। জীবনের শুরুতে ইকবাল উর্দু-ফার্সি ভাষা শিক্ষা করলেও ধর্মীয় বিষয়ে তার পড়াশোনা ছিল ব্যক্তিগত অধ্যয়ননির্ভর। এ ক্ষেত্রে তার নির্ভরযোগ্য কোনো শিক্ষকের কথাও জানা যায় না!

শিক্ষাজীবন শেষে ইকবাল আইনব্যবসার পাশাপাশি কাব্যচর্চা শুরু করেন। অল্প দিনেই তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেন এবং ইংরেজদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। ১৯২২ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ তাকে নাইট ব্যাচেলর উপাধিতে ভূষিত করেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে ইকবাল সুপরিচিত। তার অনেক কবিতাই এই রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা তীব্র প্রভাবিত। তবে ইকবাল তার কাব্যে ইসলামি চেতনা ও ঐতিহ্যের কথা বলতেন। তার কবিতাগুলো

উপমহাদেশের লাখো মানুষকে আলোড়িত করেছে। অখণ্ড ভারতের পক্ষে থাকা আলেম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানিকে তীব্র কটাক্ষ করেও ইকবাল কবিতা রচনা করেছিলেন। পরে অবশ্য জনরোষের মুখে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং মাওলানার প্রশংসা করে দুটি চিঠি পাঠান। ইকবাল পশ্চিমা সভ্যতার কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং তার কাব্যে তিনি তীব্রভাবে একে আঘাত করেছেন। কিন্তু নিজের অজান্তেই তিনি পশ্চিমা দার্শনিকদের অনেকের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, যা তার ধর্মীয় বক্তব্য-বিবৃতিতে প্রায়ই ধরা পড়ত। ইকবালের এমন কিছু বক্তব্য দেখা যাক!

১। নবুওত সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

A prophet may be defined as a type of mystic consciousness in which 'unitary experience' tends to overflow its boundaries, and seeks opportunities of redirecting or refashioning the forces of collective life.[১]

নবীকে বলা যেতে পারে এক ধরনের মরমীয় চৈতন্যের প্রতীক, যার মধ্যে অখণ্ড অভিজ্ঞতা আপনার সীমা অতিক্রম করে এবং সমষ্টিগত জীবনের গতির মোড় ফেরাবার অথবা একে নতুন রূপ দেওয়ার সুযোগ সন্ধান করে।[২]

নবুওতকে মরমি অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা দেওয়া বড় মাপের ভুল। সাইয়েদ হুসাইন আফফানি বলেন, 'ইকবালের এই কথা সঠিক নয়। মরমি অনুভূতি যে কেউ চাইলেই অর্জন করতে পারে। সুফিদের রিয়াজত-মুজাহাদার মাধ্যমেই এটি অর্জিত হয়; কিন্তু নবুওত কেউ নিজের চেষ্টা-মেহনত দ্বারা অর্জন করতে পারে না।[৩]

ওহি সম্পর্কেও ইকবালের বক্তব্য বেশ অস্পষ্ট। তার মতে—

Indeed the way in which the word WaÁâ (inspiration) is used in the Qur'an shows that the Qur'an regards it as a universal property of life though its nature and character are different at different stages of the evolution of life.[৪]

---

১. *দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*, ৭৫

২. *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, ১১০। অন্যত্র ইকবাল বলেন, 'মরমীয় অভিজ্ঞতা একটা জীবন্ত ব্যাপার। এই অভিজ্ঞতা গুণগত বিচারে নবীর অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন জাতীয় নয়।', পৃষ্ঠা, ১১১

৩. *আলাম ওয়া আকযাম ফি মিজানিল ইসলাম*, ২/৩০১

৪. *দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*, ৭৫

বস্তুত কুরআনে ওহি শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়—ওহি হচ্ছে জীবনের একটি বিশ্বজনীন ধর্ম, যদিও এর প্রকৃতি এবং স্বরূপ জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার।[১]

দেখা যাচ্ছে, ইকবালের দার্শনিক মারপ্যাঁচে ওহির মূল মর্মই যেন হারাতে বসেছে। ইকবালের এ সম্পর্কিত বক্তব্যটি ধোঁয়াশাপূর্ণ ও অস্পষ্ট।

২। ইকবালের মতে জান্নাত-জাহান্নাম দুটি হালত বা অবস্থামাত্র, এটি কোনো বিশেষ স্থান নয়। তিনি বলেন—

Heaven and Hell are states, not localities. Their descriptions in the Qur'an are visual representations of an inner fact.[২]

বেহেশত ও দোজখ, দুটি অবস্থাবিশেষ, স্থান নয়। কুরআনের এ সব বর্ণনা হল একটি অন্তর্নিহিত সত্যের বাহ্য দৃষ্টিসুলভ রূপ।[৩]

ইকবালের মতে—জান্নাত হল, ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহের উপর বিজয় লাভজনিত পরম আনন্দ। দোজখ হল, ব্যক্তির মানুষ হিসাবে কর্তব্যচ্যুতির পরম বেদনাদায়ক অনুভূতি। অর্থাৎ, দুটিই মানসিক দুটি অবস্থামাত্র![৪] এটি কোনো স্থান বা কাঠামো নয়। বলা বাহুল্য, ইকবালের এই বক্তব্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাসবিরোধী মনগড়া আলাপ। তার এই কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি একাধারে ভ্রান্ত সুফি ও পশ্চিমা দার্শনিকদের বক্তব্য দ্বারা তুমুল প্রভাবিত ছিলেন এবং তার শরয়ি জ্ঞান ও বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের অভাব ছিল। ড. মুহাম্মদ আল-বাহি বলেন, 'ইকবাল শরয়ি নুসুস থেকে অনেক দূরে গিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।'[৫]

৩। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে যে সেক্যুলারধারা তুরস্কের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, ইকবাল তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময় তিনি খেলাফত-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নেই বলেও ঘোষণা দেন। ইকবাল বলেন—

---

১. *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, ১১০

২. *দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*, ৭৩

৩. *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, ১০৯। ইকবালের মতে, চিরন্তন দোজখ বলে কিছু নেই।

৪. Hell the painful realization of one's failure as a man. Heaven is the joy of triumph over the forces of disintegration.

৫. *আল-ফিকরুল ইসলামিল হাদিস ওয়া সিলাতুহু বিল ইস্তিমারিল গরবি*,

The Turks argue that in our political thinking we must be guided by our past political experience which points unmistakably to the fact that the idea of Universal Imamate has failed in practice. It was a workable idea when the Empire of Islam was intact. Since the break-up of this Empire independent political units have arisen. The idea has ceased to be operative and cannot work as a living factor in the organization of modern Islam. Far from serving any useful purpose it has really stood in the way of a reunion of independent Muslim States. Persia has stood aloof from the Turks in view of her doctrinal differences regarding the Khilafat; Morocco has always looked askance at them, and Arabia has cherished private ambition. And all these ruptures in Islam for the sake of a mere symbol of a power which departed long ago. Why should we not, they can further argue, learn from experience in our political thinking.[১]

তুর্কিদের যুক্তি এই যে, কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার বেলায় অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতার দিকে আমরা কিছুতেই চোখ বন্ধ করতে পারি না। সে অভিজ্ঞতার অকুণ্ঠিত রায় এই যে, কার্যক্ষেত্রে সর্বজনীন ইমামত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মুসলিম সাম্রাজ্য যখন একচ্ছত্র ছিল, তখনও এ ধরনের ধারণা কার্যকরী ছিল। এ সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে ভিন্ন ভিন্ন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের জন্ম দিয়েছে। অতএব, ইসলামের অধুনাতন ব্যবস্থাপনায় খেলাফতের ধারণা আর নতুন করে কার্যকারী হতে পারে না। জীবন্ত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবার ক্ষমতা এর আর নেই। খেলাফতের দ্বারা এখন কোনো উপকার হওয়া তো দূরের কথা, বরং এই খেলাফতের ধারণাই বর্তমানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একত্রীকরণের পথে বড় বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলাফত-সংক্রান্ত মতভেদের দরুন ইরান তুরস্ক থেকে দূরে সরে গেছে, মরক্কো এ ব্যাপারে রয়েছে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে আর আরব এ নিয়ে প্রচ্ছন্ন দুরাশা পোষণ করছে। এ এক নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার যে, ক্ষমতার একটি অকিঞ্চিৎকর প্রতীকমাত্র নিয়ে এত কাড়াকাড়ি, যার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে অনেক কাল আগে। ইতিহাসের যুক্তি তুর্কিদের এই মতবাদকে সমর্থন করে।[২]

---

১. *দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*, ৯৪
২. *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, ১৩৬

ইকবালের মতে তুর্কিদের এই যুক্তিগুলো যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারলে তা থেকে একটি আদর্শিক জাতি জন্মলাভ করতে পারে। ইকবালের মতে, এমনকি এটিই ইসলামের মৌলিক ভিত্তি! নাউজুবিল্লাহ!

ইকবাল ছিলেন তুরস্কের সেক্যুলারিজমের অন্ধ সমর্থক। মূলত শরয়ি জ্ঞানশূন্য চিন্তাবিদদের চিন্তাধারাগুলো এমন বিভ্রান্ত পথেই ঘুরপাক খায়। আতাতুর্কের সবগুলো সিদ্ধান্তকে ইকবাল স্বাগত জানান, তুরস্কের সেক্যুলার কবিদের কবিতা তিনি উদ্ধৃত করেন পরম মুগ্ধতায়। কথিত নারী অধিকার, আরবি ভাষার চর্চা সীমিত করা—প্রতিটি বিষয়কেই ইকবালের মনে হয়েছে যৌক্তিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। ইকবাল মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছেন, 'তুরস্ক আজ নতুন মূল্যমান সৃষ্টির কাজে লেগে গেছে।'[১]

৪। ইকবালের ধর্মীয় চিন্তা মডার্নিজম দ্বারা কী পরিমাণ প্রভাবিত ছিল, তা বোঝা যায় তার *দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম* বইটি পাঠ করলেই। এই বইতে ধর্মীয় যে কোনো বিষয় ব্যাখ্যার জন্য সালাফে সালেহিনের বক্তব্য উপস্থাপনের পরিবর্তে তিনি পশ্চিমা দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজ-গবেষক প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শরিয়ার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও সাহায্য নিয়েছেন পশ্চিমাদের। ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে শুধু কুরআনকেই উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু সেখানে ব্যাখ্যা করেছেন নিজের মতো মনগড়া ব্যাখ্যা! পাশ কাটিয়ে গেছেন মুফাসসিরদের স্বীকৃত মূলনীতি, কুরআন থেকেই প্রমাণ করেছেন জান্নাত-জাহান্নাম দুটি অবস্থা বা অনুভূতিমাত্র, স্থান নয়! নাউজুবিল্লাহ!

ইকবালের পাশ্চাত্য-মুগ্ধতা বোঝাতে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইসলামি আইনের চার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি গোল্ডজিহার, নওমান প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়েছেন; এমনকি হাদিসশাস্ত্রের উপর গোল্ডজিহারের চালানো অপপ্রচারেও ইকবাল ছিলেন মুগ্ধ! উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই তিনি লিখেছেন—'আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে অধ্যাপক গোল্ডজিহার ঐতিহাসিক সমালোচনার এ কালগ্রাহ্য সূত্রাবলির সাহায্যে হাদিসশাস্ত্রের

---

১. ইকবাল মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের প্রশংসা করেও কবিতা লিখেছিলেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত *পয়ামে মাশরেকে* এমন একটি কবিতা আছে। কিন্তু দেড় দশক পরে ইকবালের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়। তিনি আতাতুর্কের বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত *জরবে কালিম* গ্রন্থে তিনি আতাতুর্কের বিরোধিতাও করেন। কিন্তু এ সবই ছিল ব্যক্তির বিরোধিতামাত্র। তুরস্কের সেক্যুলারিজমের যে কাঠামোকে তিনি মুসলমানদের উন্নতির মাধ্যম মনে করতেন, সে বিষয়ে তার চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়নি।

অন্তর্ভেদী পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই শাস্ত্রসম্ভার মোটের উপর বিশ্বাসের অযোগ্য।'[১]

হাদিসশাস্ত্র পর্যালোচনায় গোল্ডজিহার ও আরেকজন প্রাচ্যবিদকে উদ্ধৃত করতে পারলেও কোনো মুহাদ্দিসকে উদ্ধৃত করার মুরোদ হয়নি তার! মুহাদ্দিসিনদের যাচাই-পদ্ধতির উপর আস্থা না রেখে সমাধান পেয়েছেন গোল্ডজিহারের কাছেই। তার পাশ্চাত্য-মুগ্ধতার এক হাস্যকর নমুনা হয়ে রইল তার এই বইটি। আজকাল যারা কথায় কথায় ইকবালকে থানভি, জাফর আহমদ উসমানি বা কাশ্মিরির চেয়ে বড় ইসলামবেত্তা বলে ঘোষণা দেন, এই বইটি যেন তাদের দাবিকেই বিদ্রূপ করছে![২]

মুহাম্মদ আসাদ

মুহাম্মদ আসাদ ছিলেন গত শতাব্দীর প্রভাবশালী লেখকদের একজন। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়ান ইহুদি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল লিওপোল্ড উইস। যৌবনের শুরুতে তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক। ১৯২৬ সালে আরববিশ্ব সফরকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আসাদ আরবি ভাষা শিক্ষা করেন এবং এই ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কিন্তু ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রগুলো—যেমন হাদিস, ফিকহ, তাফসির—এ সব বিষয়ে তার পড়াশোনা ছিল ব্যক্তিগত অধ্যয়ননির্ভর।

১৯৩০ সালের পর আসাদ অবিভক্ত ভারতে আসেন এবং ড. ইকবালের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। ইকবাল এ সময় আসাদকে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় আসাদের *ইসলাম অ্যাট দ্য ক্রসরোড*। এই বইতে আসাদ মুসলমানদেরকে পশ্চিমের অনুকরণ এড়িয়ে ইসলামের ঐতিহ্যের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ *রোড টু মক্কা*। অনুপম সাহিত্যশৈলীর মাধ্যমে এই বইতে তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস তুলে ধরেন। এতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও স্পষ্ট আলোচনা দেখা যায়।

---

১. *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, ১৪৬। মূল ইংরেজি পাঠ, Among their modern critics Professor Goldziher has subjected them to a searching examination in the light of modern canons of historical criticism, and arrives at the conclusion that they are, on the whole, untrustworthy.

২. ইকবালের চিন্তাগত বিচ্যুতির তালিকা আরও দীর্ঘ। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে এখানেই আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা হল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে পাকিস্তান সরকার তাকে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব দেন এবং 'ইসলামি পুনর্গঠন' নামে একটি সংস্থা গঠন করে এর দাযিত্ব তাকে দেওয়া হয়। দু বছর এ সংস্থার দায়িত্ব পালনের পর তিনি কূটনীতিক হিসাবে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিভাগের প্রধান হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। জাতিসংঘের পাকিস্তান মিশনের মিনিস্টার প্লেনিপোটেনশিয়ারি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৫২ সালের পর থেকে আসাদ সকল দায়িত্ব ছেড়ে কেবল লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (১৯৯২) তিনি লেখালেখিতে সক্রিয় ছিলেন। কুরআনুল কারিমের একটি ইংরেজি অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেন, যা শিক্ষিত মহলে বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশেও ধর্মীয় ঘরানার অনেকের কাছে এটি বেশ পছন্দের।

মুহাম্মদ আসাদ এই তাফসিরে মডার্নিস্ট-চিন্তার বাইরে যেতে পারেননি। সালাফে সালেহিনের মানহাজের বাইরে গিয়ে নিজস্ব এমন সব ব্যাখ্যা তিনি দাঁড় করিয়েছেন, যা বিভ্রান্তিকর। বিশেষ করে মোজেজা-সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে তিনি এমন ব্যাখ্যা করেছেন, যা থেকে তার মোজেজা অস্বীকার করা প্রমাণিত হয়! ড. ওয়াজিহ হামদ আবদুর রহমান এ ব্যাপারে বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে লিখেছেন, 'মুহাম্মদ আসাদ বিচ্ছিন্ন ও সামগ্রিকভাবে মোজেজা অস্বীকারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। যেমন বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণের বিষয়কে তিনি মনে করেন, একটি রূপকমাত্র! আর তার কাছে এর অর্থ হল—মুসলমানদেরকে মনের দিক থেকে শক্তিশালী করা, তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা!'[১]

আসাদের মতে—খিজির আলাইহিস সালাম, লোকমান আলাইহিস সালাম কিংবা জুলকারনাইন কোনো ব্যক্তি বা চরিত্র নন, তাদেরকে কুরআন উপস্থাপন করেছে নিছক উপমা বা প্রতীক হিসাবে! আসাদ মনে করতেন—নবীজির শারীরিকভাবে মেরাজ হয়নি, মেরাজ মূলত আধ্যাত্মিক! আসাদ স্পষ্টই বলেছেন, 'ইবরাহিম আ.-কে সশরীরে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়নি। এ বিষয়ে কুরআনে কোনো প্রমাণ নেই।' তার মতে—কুরআনে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, তা অত্যাচারের আগুন! বলা বাহুল্য, এভাবেই তিনি

১. *ওয়াক্ফাতুন মাআত তারজামাতুল কুরআন আল-ইনজিলিজিয়া*, ১৫-১৬

আকলের পূজা করা বেছে নিয়েছেন। অনেক দূরবর্তী অর্থ, যা শুধু হাস্যকরই নয়, বরং অন্যান্য আয়াতকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি করে।

এমন এক-দুটি নয়, বরং প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান, যেখানে আসাদ ঘটনাপ্রবাহকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্র ধরে। যেখানেই এমন কোনো ঘটনা এসেছে, যা আকল দ্বারা বা প্রচলিত বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, সেখানেই তিনি বলে দিয়েছেন—কুরআনে এই বিষয়টি আনা হয়েছে রূপকার্থে। তিনি এ জন্য নতুন একটি পরিভাষা এনেছেন। তিনি একে বলছেন 'কিসসায়ে খিরাফিয়া' বা রূপকথা। নাউজুবিল্লাহ! আসহাবে কাহাফের ঘটনাকেও তিনি এক বাক্যে রূপকথা বলে দিয়েছেন। নারীদের হিজাব বিষয়ে আসাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচণ্ড আপত্তিজনক।[১]

মুহাম্মদ আসাদের এ সব ভ্রান্ত চিন্তা ও উপস্থাপন পরের দিকের মডার্নিস্টদের অনেককে তীব্র মুগ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জামায়াতে ইসলামি ঘরানার তাত্ত্বিক ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত শাহ আবদুল হান্নানের কথা। এক লেখায় তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'আসাদ তার তাফসিরে অনেক বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, কিন্তু কুরআনের আয়াতের অর্থের আওতাধীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দাসীদের বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ এবং হুর সম্পর্কিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যায়। মুহাম্মদ আসাদের পুরো তাফসির একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি।' শাহ আবদুল হান্নানের মতে, আসাদের তাফসির একটি লিঙ্গপক্ষপাতমুক্ত তাফসির!

লেখার শুরুতে আমরা বলেছি, প্রত্যেক মডার্নিস্টই দাবি করে, আজ পর্যন্ত তার মতো নিখুঁতভাবে কেউ ইসলামকে বুঝতে পারেনি; মুহাম্মদ আসাদ ও তার সমর্থকদের কার্যক্রম দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

---

১. মুহাম্মদ আসাদের এ সব বিকৃতি জানতে দেখুনঃতার লিখিত কুরআন তরজমা *দ্য মেসেজ অব দ্য কুরআন।* আসাদের এ সব বিকৃতির বিরুদ্ধে যারা কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে সাইয়েদ হুসাইন আফফানি অন্যতম। তার লিখিত *আলাম ওয়া আকজাম ফি মিজানিল ইসলাম* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

কথার চাকচিক্য : বাহ্যিকতার আড়ালে লুকানো বিষ

পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা প্রভাবশালী মতবাদের ভারে ইসলামপন্থিদের একাংশের মধ্যেও ভর করেছে পরাজিত মানসিকতা। ইসলামের নানা বিধিবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রায়ই তারা আধুনিক নানা চিন্তাধারার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। হাজার বছরের ইলমি তুরাস ও সালাফদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিবর্তে তারা প্রাধান্য দিচ্ছেন নিজেদের খেয়াল-খুশিকে। নিজেদের চিন্তাধারা ও ব্যাখ্যাকে একমাত্র সঠিক মত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা আশ্রয় নিচ্ছেন নানা ধরনের যুক্তি ও উসুলের। আলোচনা ও লেখালেখিতে বারবার এই যুক্তিগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সবকে অকাট্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু উক্তি ও যুক্তিকে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন তারা। ধর্মীয় পরিমণ্ডলেও আজকাল এ সব যুক্তি ও উক্তি ব্যবহার করে খুলে দেওয়া হচ্ছে তাহরিফের দুয়ার। অবলীলায় অস্বীকার করা হচ্ছে ইলমি তুরাসকে, হাজির করা হচ্ছে নতুন নতুন ব্যাখ্য—যেখানে প্রায়শই সিরাতে মুস্তাকিমের পথ ছেড়ে খুঁজে নেওয়া হয় বিভ্রান্তির চোরাগলি!

যে সব উক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেওয়া হয়, এগুলো তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। উক্তিগুলো বেশ সরল এবং গভীর থেকে বিষয়টি নিয়ে না ভাবলে যে কেউ এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সাধারণভাবে উক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়—এগুলো সব এক সুতায় গাথা! সবগুলো উক্তি মূলত একটি নির্দিষ্ট চিন্তা প্রচার করতেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু বেশির ভাগ মানুষ গভীর থেকে চিন্তা করতে আগ্রহী নয়, ফলে তারা এ সব উক্তির পিছনে লুকিয়ে-থাকা মূল চিন্তাটি ধরতে পারে না। শায়খ ফাহাদ আজলান এ ধরনের একাধিক উক্তি ও যুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন তার *জুখরুফাল কওল* বইতে। তিনি দেখিয়েছেন, এই ধরনের উক্তিগুলোর ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে কথা বলা যাক!

১। বহুল প্রচার। এই ধরনের উক্তিগুলো বহুলপ্রচারিত হয়। অনেক সময় এই প্রচারণায় মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীমহলও অংশ নেয়। নানা আঙ্গিকে প্রচারণার ফলে জনসাধারণের মনে এ ধরনের উক্তির প্রতি এক ধরনের ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। এক ধরনের বিভ্রমও তৈরি হয় জনমনে, যার ফলে মনে হয়, এই বিষয়ে এটিই বুঝি শেষ কথা! এর বিপরীত কোনো অবস্থান থাকতে পারে না। প্রচারণার কারণে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা করতে চায় না। তারা ধরে নেয়, বিষয়টি অকাট্য ও চূড়ান্ত।

২। স্পষ্টতা। এ ধরনের উক্তিগুলো খুব স্পষ্ট হয়। এতে কোনো হেঁয়ালি বা ধোঁয়াশা থাকে না। এই কারণে এগুলো খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যে এই উক্তিগুলো কিছু সামাজিক বাস্তবতা চিহ্নিত করে, যার ফলে সমাজের যে কোনো শ্রেণির মানুষের কাছেই এগুলো গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

৩। কৌশলী সংশয়। সাধারণত এই বাক্যগুলোতে এমন কোনো বিভ্রান্ত চিন্তা উপস্থাপন করা হয় না, যা প্রত্যাখ্যানে সবাই একমত। এমনটা করা হলে শুরুতেই বাক্যটি আস্থা হারাবে। ফলে এগুলো গঠন করা হয় সতর্কভাবে। বাহ্যিকভাবে এখানে কোনো বিভ্রান্তি থাকে না। বিভ্রান্তি লুকিয়ে রাখা হয় আড়ালে। বাহ্যিক অবস্থানটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন এটি সর্বজনস্বীকৃত একটি অবস্থান। অধিকাংশ মানুষ এর ভিতরগত জটিলতা ধরতে পারে না।

৪। নেতিবাচক ফলাফল। উক্তিগুলো যতটা সরল আর স্পষ্টই মনে হোক না কেন, একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, এগুলোর নানা নেতিবাচক ফলাফল রয়েছে। ঘুরেফিরে সবগুলো উক্তির ফলাফলেই দেখা যায়, শরিয়ায় কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতিকে অপসারণ করে সেখানে নতুন চিন্তা প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চলছে। এমন কোনো নতুন চিন্তা ও মতবাদ গ্রহণের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, যা শরিয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কখনও এ সব উক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে শরিয়ার অনুসরণকে হাস্যকর করে তোলার চেষ্টা চালানো হয়। কখনও শরিয়ার পরিপূর্ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। এ সব বক্তব্যের মাধ্যমে অনেক সময় মুসলমানদের ঈমান দুর্বল করে ফেলা হয়। গুনাহের প্রতি ঘৃণার অনুভূতিকে হালকা করে তোলা হয়। ব্যক্তি নিজেকে প্রবোধ দেয়, সে তো হকের সীমানার ভিতরেই আছে।

এ ধরনের কিছু উক্তির নমুনা দেখা যাক :

১। কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

২। সুন্নাহর সবটুকু শরিয়ার অংশ নয়।

৩। এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ নেই।

৪। একে বিজ্ঞান সমর্থন করে না।

৫। এই মাসআলায় ইখতেলাফ আছে।

৬। তারা তো শরিয়ার খোলস নিয়ে পড়ে আছে।

৭। আমাদেরকে শরিয়ার রুহ আঁকড়ে ধরতে হবে।

৮। অন্য জরুরি বিষয় বাদ দিয়ে এটা নিয়ে মেতে আছেন কেন?

৯। দুনিয়া বদলে গেছে।

১০। অধিকাংশ লোক এমন করে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, ধর্মীয় নানা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে ঘুরেফিরে এই কথাগুলো বলা হয়। এর মধ্যে কয়েকটি কথা আছে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় সত্য হলেও বিশেষ উদ্দেশ্যে একে ব্যবহারের ফলে মূল অর্থই বদলে যায়! প্রশ্ন হল, এই ধরনের চাকচিক্যময় কথার আড়ালে লুকিয়ে-থাকা বিভ্রান্তি অনুধাবনের জন্য করণীয় কী? শায়খ ফাহাদ আজলানের মতে, এ ধরনের উক্তির মুখোমুখি হলে প্রভাবিত না হয়ে কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করা উচিত। তা হলেই এর মূল রূপটি প্রকাশিত হবে। এ ধরনের উক্তিগুলো বিশ্লেষণের জন্য নিম্নের কাজগুলো করা যেতে পারে।

১। সংক্ষিপ্ত বাক্যের বিশ্লেষণ। সাধারণত এই উক্তিগুলো হয় খুব সংক্ষিপ্ত। এর আড়ালে লুকিয়ে থাকে কিছু সত্য ও কিছু মিথ্যা। এ সব বাক্য পুরোপুরি গ্রহণ করাও ভুল, আবার শত ভাগ প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। এ ধরনের উক্তি সামনে এলে প্রথম কাজ এর প্রতিটি অংশকে আলাদা করে যাচাই করা এবং আড়ালে লুকিয়ে-থাকা বার্তাটিও স্পষ্ট করা। এতে করে উক্তির বিভিন্ন অংশ পৃথক হয়ে পড়বে এবং শুদ্ধ ও সঠিক অবস্থানটিও নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এরপর ব্যাখ্যাসাপেক্ষে এই উক্তিগুলো গ্রহণ করা নিরাপদ।

২। খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির প্রভাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলা। এই উক্তিগুলোর একটা বড় শক্তি হল, এর প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি। কিছু কিছু উক্তি এত বেশি প্রচারিত যে, প্রথম ধাপেই মানুষ প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এক প্রকার বাধ্য হয়েই অনেকে এ সব উক্তি মেনে নেয়। এই বিষয়টি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। কারণ, এই প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি মূলত নকল। এটি সব সময় সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। ব্যাপক প্রচার ও চর্চা কখনওই ভুল-শুদ্ধের মাপকাঠি হতে পারে না।

বহুলপ্রচারিত উক্তিগুলোকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করলেই এর পিছনের বার্তা পরিষ্কার হয়।

৩। মূল ভিত্তি নির্ণয় করা। কিছু বাক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ভুল চিন্তার উপর। কিন্তু বাক্যটি নিয়ে এত বেশি আলোচনা হয়, যে কারণে এর উৎপত্তিস্থল ধরতে পারে না অনেকে। অনেক সময় এর ভিত্তিকে নির্ণয় না করেই আলাপ এগিয়ে নেওয়া হয়। এ ধরনের আলোচনা অর্থহীন। এর কোনো ফলাফল নেই। এ ধরনের বাক্যকে খণ্ডন করার আগে এর উৎপত্তিস্থলে থাকা চিন্তাটিকে যাচাই করতে হবে, শব্দ ও অন্তর্নিহিত মর্ম নিয়ে ভাবতে হবে এবং সেগুলোর কী কী প্রভাব ও ফলাফল হতে পারে, তা মাথায় রাখতে হবে।

৪। বেঁধে-দেওয়া ছক থেকে মুক্ত হওয়া। কিছু বাক্যের গঠন থাকে খুবই সীমাবদ্ধ। সেখানে ব্যক্তিকে এর কোনো একটি দিক গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে বলা হয়। সাধারণত এ সব বাক্যে দেখানো হয়, এই দুইয়ের মাঝামাঝি আর কোনো অবস্থান হতে পারে না। কিছু ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক ও সঠিক হলেও অনেক ক্ষেত্রে এটি মূলত একটি ফাঁদ। মনে রাখতে হবে, যৌক্তিক অবস্থান এ দিকে বা ও দিকে থাকতেই হবে, এমনটি জরুরি নয়। তৃতীয় একটি দিকও থাকতে পারে, যা সত্য ও সঠিক; কিন্তু এ সব বাক্যের গঠন থেকে সেটি বোঝার উপায় থাকে না। ইচ্ছাকৃতভাবেই আড়াল করা হয় সঠিক অবস্থানটি। শ্রোতাকে বাধ্য করে নির্দিষ্ট ছকের ভিতর চিন্তা করতে। অনেক মানুষ এখানে ধোঁকা খায়। এই দুই অবস্থানের বাইরেও সত্য থাকতে পারে, তা সে চিন্তাই করে না। এই বেঁধে-দেওয়া ছক থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি।

৫। প্রেক্ষাপট মাথায় রাখা। অনেক বাক্য মৌলিকভাবে সত্য ও বাস্তব হলেও ভুল স্থানে প্রয়োগের ফলে এর অর্থই বদলে যায়। সঠিক কথাও যদি ভুল জায়গায় প্রয়োগ হয়, তা হলে ভুল অর্থ প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়।

আলি রাজি.-এর সময়কালে খারেজিরা বলত, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ফয়সালাকারী নেই।' মৌলিকভাবে এই কথা সত্য ও সঠিক। কিন্তু তাদের প্রয়োগক্ষেত্রটি ছিল ভুল। আলি রাজি. ধরতে পেরেছিলেন তাদের সমস্যাটি। তাই তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'খারেজিদের কথা সত্য, কিন্তু মতলব খারাপ।' বহুলপ্রচারিত উক্তিগুলো যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

৬। ফলাফল অনুধাবন করা। কিছু বাক্য এমন রয়েছে, যার ভুল বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে—এই বাক্যগুলো কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে! এই বাক্য সঠিক মেনে নিলে কী কী ফলাফল সামনে আসছে! কিছু বাক্য মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে বিচিত্র জালে আটকে ফেলে। সে দেখতে পায়, একটি বাক্য মেনে নেওয়ার কারণে আবশ্যিকভাবেই আরেকটি বিষয় মেনে নিতে হচ্ছে। সেটি মানলে আরেকটি মানতে হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা ক্রমে তাকে হকের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, শরিয়ার প্রতিষ্ঠিত কোনো মূলনীতিই লঙ্ঘন করতে হচ্ছে! যদিও শুরুতে বোঝা যায়নি, বিষয়টি এত দূর গড়াবে। তাই ভুল উক্তির সমস্যা নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি হল, এই উক্তি সাব্যস্ত হলে কী কী সাব্যস্ত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল দেয়, তা লক্ষ রাখা।

৭। শরিয়তের মেজাজের দিকে লক্ষ রাখা। কিছু বাক্য থেকে বিপরীতমুখী দু ধরনের অর্থ নেওয়ার সুযোগ থাকে। এর মধ্যে কোনো একটি অর্থ শরিয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিকও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, প্রচারকারীরা বাক্যটিকে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে! যদি শরিয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক অর্থটিই তাদের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তা পরিত্যাজ্য হবে। অনেকে নিজেদের বিভ্রান্তি ও গোমরাহির সমর্থনে বাহ্যিকভাবে শুদ্ধ কোনো কথা বা বাক্যকে ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে শরিয়াকে সামনে রাখলে আলোচনা এগোনো সহজ হবে।

‘এই মাসআলায় ইখতেলাফ আছে’

‘এই মাসআলায় ইখতেলাফ আছে’—কথাটি লোকমুখে প্রচুর শোনা যায়। শরয়ি দিক বিবেচনা করলে বাক্যটি শুদ্ধ। এতে বাহ্যিক কোনো ভুল নেই। ফিকহি সব বিধানের ক্ষেত্রে ইমামরা একমত হননি। দলিলের আলোকেই তারা একে-অপরের সঙ্গে দ্বিমত করেছেন। তাদের ইজতিহাদের ফলাফল ভিন্ন হয়েছে। একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ফিকহের নানা ধারা ও মাজহাব। প্রতিটি ধারায় গড়ে উঠেছে নস বিশ্লেষণের স্বতন্ত্র মূলনীতি। এই ফিকহি মতভেদ নতুন কিছু বা নিন্দনীয় নয়। মুসলমানদের ইলমি তুরাসের অংশ এই মতবিরোধ। এর কারণ হল, শরিয়ার সকল বিধান এক স্তরের নয়। সকল বিধান অকাট্যও নয়। নসের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা ভিন্নতা। ফলে ইজতিহাদ এবং ফলাফল বিভিন্ন হতে বাধ্য।

'এই মাসআলায় ইখতেলাফ আছে' বলে যদি এই বাস্তবতার দিকে ইশারা করা হয়, তা হলে এতে কোনো সমস্যা নেই। যারা ইখতেলাফের গুরুত্বকে উপেক্ষা করতে চায়, তাদের খণ্ডনের ক্ষেত্রেও বাক্যটি চমৎকার। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই উক্তি সামনে আনা হয় শরিয়ার কোনো বিধানে ছাড় খোঁজার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শরিয়ার কোনো স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে পাশ কাটিয়ে নতুন কোনো বিভ্রান্তির বৈধতা দিতে উক্তিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে উক্তিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো ফিকহি মত বা বিধানকে এমন অকাট্য মনে করার কিছু নেই, যার আওতা থেকে বের হওয়া জায়েজ হবে না। বরং সব বিষয়েই নানা মত আছে। একটি গ্রহণ করলেই হয়। এই উদ্দেশ্যে বাক্যটির প্রয়োগ ভুল। কারণ, এই বাক্য প্রচার করে সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানো হয়।

১। ছাড় অনুসন্ধান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই বাক্য বলার মাধ্যমে ছাড় গ্রহণের চেষ্টা চালানো হয়। মানুষের মনে সহজ ও আরামদায়ক মতটি গ্রহণের তাড়না জাগিয়ে তোলা হয়। তখন আর শরিয়ার বিধান জানা উদ্দেশ্য থাকে না। ইলম ও দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক বিষয়টি জানার পরিবর্তে রুখসত বা ছাড় তালাশ করাই হয়ে ওঠে মূল উদ্দেশ্য। শরিয়ার অনেক বিষয়েই একাধিক মত আছে। এই মতগুলোর সবগুলো গ্রহণযোগ্য এমনও নয়। অনেক ক্ষেত্রে আলেমদের পদস্খলন হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে তাদের মতটি শাজ হিসাবে বিবেচ্য। অথবা কোনো একটি মত তারা বিশেষ প্রেক্ষাপটে দিয়েছিলেন, যা এখন অনুসরণীয় নয়। কিন্তু এই সব বিষয় এড়িয়ে শুধু ইখতেলাফকেই সামনে আনা হয় নিজের খেয়াল-খুশিমতো শরিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে।

এটি একটি ভুল প্রবণতা। আলেমরা নানা বিষয়ে ইখতেলাফের পরেও একটি ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তা হল, ছাড় অনুসন্ধান করা হারাম। তাদের এই ঐকমত্যের কারণ স্পষ্ট ও অকাট্য। কারণ, ছাড় অনুসন্ধানের এই মানসিকতা শরিয়ার মূল কাঠামোকেই নড়বড়ে করে ফেলে। এই মানসিকতা থেকেই এক দল মানুষ বিচ্ছিন্ন মত এনে গান-বাজনা জায়েজের ঘোষণা দেয়। আরেক দল পর্দার বিধানকে গায়েব করে ফেলে। কেউ দাবা খেলাকে ইসলামি সংস্কৃতির অংশ ঘোষণা দেয়। কেউ সুদ বৈধ করার চেষ্টা চালায়। যদি সকল বিচ্ছিন্ন মতকেই মানুষ অনুসরণযোগ্য করে ফেলে, তা হলে শরিয়ার মূল চেহারাই বদলে যাবে।

সাধারণত ইখতেলাফের উদ্দেশ্য হয় শরিয়ার বিধান অনুসন্ধান। প্রবৃত্তির অনুসরণ বা নফসের চাহিদা মেটানো এর উদ্দেশ্য হতে পারে না। ইমাম শাতেবি রহ. বলেছেন, 'শরিয়া প্রণয়নের পিছনে শরিয়াদাতার উদ্দেশ্য হল, মুকাল্লাফদেরকে প্রবৃত্তির শেকল থেকে মুক্ত করা, যেন তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর গোলাম হতে পারে, যেভাবে তারা অনিচ্ছায়ও আল্লাহর গোলাম।'[১] এ জন্যই সুলায়মান আত-তাইমি বলেছিলেন, 'যদি আলেমদের ছাড় গ্রহণ করা শুরু করো, তা হলে সকল নিকৃষ্ট মত তোমার কাছে একত্র হবে। ইবনে আবদুল বার এই কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'ছাড় অনুসন্ধানের ব্যাপারে এটিই সর্বসম্মত মত। এ ক্ষেত্রে কেউ দ্বিমত করেছেন বলে আমার জানা নেই।'[২] ইমাম আওজায়ি বলেন, 'যে আলেমদের বিচ্ছিন্ন মতগুলো গ্রহণ করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।'[৩] ইবরাহিম ইবনে আদহাম বলেন, 'তুমি আলেমদের বিচ্ছিন্নমতগুলো আমল করা শুরু করলে বিপুল পরিমাণ অনিষ্টের মুখোমুখি হবে।[৪]

আব্বাসি আমলের প্রভাবশালী আলেম ইসমাইল ইবনে ইসহাক একবার খলিফা মুতাজিদ বিল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে যান। খলিফা তার দিকে একটি বই এগিয়ে দেন, যেখানে আলেমদের ভুলবশত প্রদত্ত বিভিন্ন মত একত্র করা ছিল। প্রতিটি মতের সঙ্গে দলিলগুলোও উল্লেখ ছিল। ইসমাইল ইবনে ইসহাক বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, এই বইয়ের সংকলক একজন জিন্দিক।' খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, 'বইয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো কি সহিহ নয়?' ইসমাইল ইবনে ইসহাক জবাব দিলেন, 'হাদিসগুলো সহিহ, এতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু যে আলেম নেশা করাকে হালাল বলেছেন, তিনি মুতা বিয়েকে জায়েজ বলেননি। যিনি মুতাকে হালাল বলেছেন, তিনি গান বাজনাকে হালাল বলেননি। সব আলেমেরই বিচ্যুতি আছে। যে ব্যক্তি সবার বিচ্যুতি একত্র করে গ্রহণ করবে, তার দ্বীন বরবাদ হয়ে যাবে।' খলিফা বিষয়টির ভয়াবহতা ধরতে পারেন এবং নির্দেশ দেন বইটি পুড়িয়ে ফেলতে।'[৫]

---

১. *আল-মুওয়াফাকাত*, ২/২৮৭
২. *আল-মুওয়াফাকাত*, ২/২৮৭
৩. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৭/১২৫
৪. *আল-জামি লি আখলাকির রাবি*, ২/১৬০
৫. *আস-সুনানুল কুবরা*, বর্ণনা নং ২০৯২১

তবে এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। রুখসত বা ছাড় দুই প্রকারের। প্রথমত, শরিয়ার ছাড়। দ্বিতীয়ত, ফকিহদের ছাড়। উভয়টির মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য আছে। শরিয়তের ছাড় হল, কিছু বিধানের ক্ষেত্রে কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। যেমন, মুসাফিরকে তার নামাজের ক্ষেত্রে কসর করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তিকে রমজানে রোজা না রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জান বাঁচানোর জন্য মৃত পশুর গোশত খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ সব বিধান শরিয়ার নানা দলিল দ্বারাই প্রমাণিত। কিন্তু ফকিহদের ছাড়ের অর্থ হচ্ছে, কোনো বিষয়ে ফকিহদের সবগুলো মতামত সামনে রেখে সহজ মতটি গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে শরিয়ার বিধান জানার চেয়ে নিজেদের সুবিধা গ্রহণের দিকটিই প্রাধান্য পায়। এটি একটি গোমরাহি পদ্ধতি, যেখানে উসুল ত্যাগ করে একাধিক মাজহাব ও মতামতকে জোড়াতালি দেওয়া হয়। সহজ মত খুঁজতে গিয়ে পরস্পরবিরোধী বিশৃঙ্খল একটি ধারা তৈরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে দলিলের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করা হয় না। হক অনুসন্ধানের চেয়ে নিজের নফসের চাহিদা মেটানোকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুরো মনোযোগ ও চেষ্টা ব্যয় করা হয় পছন্দসই ফতোয়া খোঁজার জন্য।

ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি স্ববিরোধী প্রক্রিয়ামাত্র। যে ফকিহ থেকে ছাড়কৃত মতামত গ্রহণ করা হয়, সেটি তার কাছে দলিলসম্মত। কিন্তু সেই একই দলিল আরেকজন ফকিহের দেওয়া আরেকটি ছাড়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু ছাড় গ্রহণের সময় সুবিধাবাধী লোকেরা এই দিকটি চিন্তা করে না। কারণ, তারা কখনওই দলিল বা উসুলের সন্ধান করে না। উদ্দেশ্য থাকে সহজ মত বের করে নিজের নফসকে তৃপ্ত করা। এ জন্যই আলেমরা এই কাজের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

২। সকল মতবিরোধকে সমান গুরুত্বদান। অনেকে ইখতেলাফের কথা বলে সকল প্রকার ইখতেলাফকে স্বীকৃতি দিয়ে বসে। যে কোনো ভিন্নমতই তাদের কাছে হয়ে ওঠে ইখতেলাফ। এমনকি তা যদি শরিয়ার স্বতঃসিদ্ধ কোনো উসুলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তবুও। এর ফলে তারা দুটি ভুলের স্বীকার হয়।

প্রথম ভুল, গুরুত্বহীন মতভেদকেও গুরুত্ব দেওয়া। মনে রাখতে হবে, সকল ভিন্নমতই ইখতেলাফ বলে গণ্য হয় না। যদি কোনো ভিন্নমত শরিয়ার সুস্পষ্ট নস বা ঐক্যমতপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তা হলে সেই ভিন্নমত ধর্তব্য নয়। স্পষ্ট শরয়ি বিধানকে এই ধরনের কোনো ভিন্নমতের দোহাই দিয়ে

বর্জন করা জায়েজ নয়। সেই ভিন্নমতকেই ইখতেলাফ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যেখানে ভিন্নমতের পক্ষে দলিল থাকে কিংবা নসের একাধিক অর্থ নেওয়ার সুযোগ থাকে। যে ভিন্নমত নস বা ইজমার পরিপন্থি হয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, 'অনেকে প্রশ্ন করে, আমি অতীত-বর্তমানের অনেক আলেমকে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ করতে দেখেছি। এই মতভেদ কি তাদের জন্য বৈধ ছিল? আমি জবাব দিই, ইখতেলাফ দুই প্রকার। একটি হারাম। অন্যটিকে আমি হারাম বলি না।'[১] সুতরাং 'এই মাসআলায় ইখতেলাফ আছে', এই কথা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাবে না। কখনও কখনও এই কথা বলে বিবেচনার অযোগ্য মতভেদও সামনে আনা হয়। স্পষ্ট নসের বিপরীতে আনা হয় বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল কোনো মন্তব্য। এটি ভুল। মুসলমানদের দায়িত্ব আল্লাহ ও তার রাসুলের কথা অনুসরণ করা। ইখতেলাফ এখানে প্রতিবন্ধক নয়। বিচ্ছিন্ন মত আঁকড়ে ধরা তো পরের কথা।

দ্বিতীয় ভুল, যেখানে ইখতেলাফ নেই, সেখানেও ইখতেলাফ দাবি করা। কিছু মতামত থাকে নির্দিষ্ট শর্ত, প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি অনুযায়ী। এগুলো সবার জানা থাকে না। এ ক্ষেত্রে নিরাপদ হল, বিজ্ঞ আলেমদের দ্বারস্থ হওয়া। তারা সহজেই বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু যারা নিজের খেয়াল-খুশিমতো এ সব মত কাজে লাগাতে চায়, তারা আলেমদের থেকে দূরে থাকে। অনেক সময় সঠিক মতটিও ভুল প্রসঙ্গে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে।

৩। ইখতেলাফকেই এক প্রকার দলিল মনে করা। যারা আমল ত্যাগের অজুহাত হিসাবে ইখতেলাফকে টেনে আনে, তারা আরেক ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়। তারা ইখতেলাফকেই সত্তাগত দলিল মনে করতে থাকে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ খোঁজে। নিজেদের বিভিন্ন কর্মের পক্ষে তারা এ সব ইখতেলাফ টেনে আনে, আমল ত্যাগের অজুহাত হিসাবেও এ সব কাজে লাগায়। তারা বলতে চায়, কোনো বিষয়ে সবাই একমত না হলে সেটি গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। এই অবস্থান শত ভাগ ভুল। ইবনে হাজম বলেন, 'আলেমদের মধ্যে এমন কেউ আজও জন্মগ্রহণ করেনি, যে বলে, কোনো বিষয়ে ইজমা না থাকলে নস গ্রহণ করা যাবে না। বরং সবাই বলে, কেউ এই আকিদা রেখে কর্মপন্থা গ্রহণ করলে সে কাফের

---

১. *আর-রিসালা*, ৫৬০

হয়ে যাবে। কারণ, সে ওহির বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করল, যাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।'[১]

এ জন্যই ইলমি ইখতিলাফের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, আলেমরা কখনও খোদ ইখতেলাফকেই দলিলের আসনে বসাননি। বরং সবাই বলেছেন, মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক হল, তিনি শরয়ি দলিলের আলোকে নিজের গবেষণা চালিয়ে যাবেন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন হকের কাছাকাছি হওয়ার। এতে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও একটি সওয়াব পাবেন। অপর দিকে মুকাল্লিদের জন্য আবশ্যক হল, নিজেকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে মুক্ত রেখে একজন নেককার আলেমের মতামত অনুসরণ করবে। এ ক্ষেত্রে কঠোর মত এড়িয়ে সহজ মত অনুসরণই যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়।

সাম্প্রতিক কালে মুসলিম-সমাজে সক্রিয় অনেক স্কলার ও চিন্তকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, তারা কোনো বিষয়ে ইখতেলাফ পেলেই তাকে বৈধতা বা স্বাধীনতা মনে করছে। সাধারণ মানুষের মনেও এমন একটি ধারণা জন্ম নিচ্ছে, 'আরে এ বিষয়ে তো ইখতেলাফ আছে, চাইলে যে কোনোটাই করা যায়!' ইমাম শাতেবি তার সময়েও এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আজকাল কোনো মাসআলায় ইখতেলাফ থাকলেই তাকে বৈধতার দলিল মনে করা হচ্ছে। আলেমদের ইখতেলাফকে বানানো হয়েছে কোনো কাজ বৈধ করার হাতিয়ার। এটি শরিয়া অনুসরণের ভুল পদ্ধতি। এর ফলে দলিল নয় এমন জিনিসকেও দলিল বানানো হয়।'

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'কোনো বিষয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে হয়তো ইখতেলাফ থাকবে অথবা থাকবে না। যদি ইখতেলাফ আছে বলেই ধরে নেওয়া হয় বিষয়টি হারাম নয়, তা হলে হারামের উপর ঐকমত্য না পেলে কিছুই তো হারাম হবে না। কোনো বিষয়ের হারাম হওয়া নিয়ে ইখতেলাফ আছে মানেই সেটি হালাল, এই চিন্তা উম্মাহর ইজমাপরিপন্থি। দ্বীন ইসলাম থেকে যোজন যোজন দূরে এর অবস্থান। এখানে আছে নিশ্চিত গোমরাহি।'[২]

সারকথা হল, শরিয়ায় ইখতেলাফের গুরুত্ব আছে। এটি ইসলামের বিধানগুলোর একটি সৌন্দর্যও বটে। তবে যে কোনো মতভিন্নতাকেই

---

১. *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম*, ৩/৩৬৭

২. *রাফউল মালাম*, ৬৩

ইখতেলাফ হিসাবে গ্রহণ করা ভুল। ইখতেলাফ গ্রহণের ক্ষেত্রেও রয়েছে নিয়ম ও সতর্কতা। এ ক্ষেত্রে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে মুক্ত হয়ে হক অনুসন্ধানকেই প্রাধান্য দিতে হবে সবার।

'ইসলামে পোপতন্ত্র নেই'

সাম্প্রতিক সময়ে বহুল প্রচারিত একটি বাক্য হল—'ইসলামে পোপতন্ত্র নেই'। সেক্যুলার-সমাজ তো বটেই, ধর্মীয় সমাজের অনেকেই দেদারসে এই কথা উদ্ধৃত করেন। এই বক্তব্যের সারমর্ম হল—দ্বীন বোঝা, দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করা, ইলমি বিষয় আলোচনা করা এগুলো কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ না। আলেম-সমাজ যেমন দ্বীন নিয়ে কথা বলে, তেমন অন্যদেরও অধিকার আছে দ্বীন নিয়ে কথা বলার। তাদের যেমন আকল আছে, জ্ঞান আছে, অন্যদেরও আছে। তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। ইলমকে শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করার সুযোগ নেই। যদি করা হয়, তা হলে এটি হবে খ্রিষ্টানদের পোপতন্ত্রের মতো, যেখানে পোপ ছাড়া অন্যরা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেত না।

বাহ্যিকভাবে কথাটি সুন্দর। অবশ্যই ইসলামে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী, জাতি বা দলের কাছে ইলম সীমাবদ্ধ নয়। এমন নয় যে, চৌধুরী বংশের সন্তান ছাড়া অন্য কেউ আলেম হতে পারবে না কিংবা অমুক অঞ্চলের লোক ব্যতীত কেউ ফিকহ নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে না। যদি এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা হলে সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, যারা 'ইসলামে পোপতন্ত্র নেই' বলেন, তারা সাধারণত এর মাধ্যমে ইলমের গুরুত্ব হ্রাস করার চেষ্টা চালান, আলেম-সমাজের ধর্মীয় অথরিটিকে নাকচ করে দেন। তারা ইসলামকে এক উন্মুক্ত প্রান্তর ঘোষণা দেন, যেখানে যে কেউই নিজের খেয়াল-খুশিমতো ইসলাম নিয়ে কথা বলার অধিকার লাভ করবে। যে কেউ চাইলে সূক্ষ্ম ইলমি বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে, এবার সেই বিষয়টি অনুধাবনের যোগ্যতা তার থাকুক আর না থাকুক! এই নৈরাজ্য কখনওই বৈধ হতে পারে না।

শরিয়ার মাসআলা দুই প্রকারের। প্রথম প্রকার, যে সব বিধান অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সকল মুসলমানই যে সম্পর্কে জানে। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, পাঁচ স্তম্ভ, নামাজের ফরজিয়ত ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিষয়ে সবারই কথা বলার সুযোগ আছে। যদি কোনো কাফেরের সামনে এই বিষয়ে

বলতে হয় কিংবা বেদ্বীন কাউকে দাওয়াত দিতে হয়, তা হলে একজন সাধারণ মুসলমানও এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আলেম-সমাজ এই বাস্তবতা কখনও অস্বীকার করেন না কিংবা কাউকে বাধাও দেন না।

দ্বিতীয় প্রকার, যে সব বিধানে অনেক শাখা-প্রশাখা ও ইলমি আলোচনা আছে এবং দীর্ঘ সময়ের অধ্যবসায় ছাড়া যা আয়ত্ত করা যায় না। এই বিষয়ে তিনিই কথা বলার অধিকার রাখেন, যিনি উপযুক্ত উস্তাদের কাছে ইলম অর্জন করেছেন। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ কেউ এসে অধিকার ফলাতে পারবে না। ধরা যাক, একজন আলেম দীর্ঘ সময় ফিকহ পড়েছেন, ইসলামি অর্থনীতির শাখা-প্রশাখাগুলো পড়েছেন, আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলক পাঠ করেছেন। সুতরাং তার অধিকার আছে বর্তমান অর্থনীতির বৈধ ও অবৈধ খাতগুলো আলোচনা করার। এখন যদি সাধারণ কোনো অর্থনীতিবিদ, যিনি শরয়ি জ্ঞান অর্জন করেননি, তিনি এসে সেই আলেমের কথাকে নাকচ করে দেন এবং বলেন, 'ইসলামে পোপতন্ত্র নেই', এই বিষয়ে আমারও ফয়সালা আছে—তা হলে সেই অর্থনীতিবিদের কথা ধর্তব্য হবে না। কারণ, বিষয়টি নিয়ে তার শাস্ত্রীয় জ্ঞান নেই।

পৃথিবীর প্রতিটি শাস্ত্রেই শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞগণ থাকেন। তাদের কেউ নাকচ করে না। বাড়ি নির্মাণের সময় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া হয় না, অসুখ হলে কেউ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যায় না, আইনের সমস্যার জন্য কেউ পদার্থবিদকে খোঁজে না! প্রতিটি বিষয়ের জন্য সেই শাস্ত্রের লোকদের শরণাপন্ন হওয়াই নিয়ম। এ ক্ষেত্রে কেউ বলে না—প্রকৌশলবিদ্যাকে ইঞ্জিনিয়াররা কুক্ষিগত করে ফেলেছে, তারা এখানে পোপতন্ত্র কায়েম করেছে! কিংবা এ কথাও বলা হয় না—ডাক্তাররা হয়ে উঠেছে চিকিৎসাবিদ্যার পোপ! সবাই স্বাভাবিক হিসাবেই বিষয়গুলো মেনে নেয়। কিন্তু ধর্মীয় বিষয় সামনে এলেই বিষয়টি মানতে নারাজ তারা। এ ক্ষেত্রে তারা মনে করে, ধর্মের প্রতিটি বিষয় নিয়ে সবার কথা বলার সমান অধিকার আছে এবং এ ক্ষেত্রে আলেমদের কোনো অথরিটি নেই!

যদি কেউ আলেম হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্ট কোনো গোত্র বা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিত, তা হলে পোপতন্ত্রের আলাপ করার সুযোগ ছিল; কিন্তু আলেম হওয়ার সুযোগ তো সবার জন্য উন্মুক্ত—যেভাবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার

হওয়ার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত! কিন্তু বিপত্তি ঘটে, যখন কেউ আলেম হওয়ার ট্র্যাডিশনাল ধারাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেকে আলেমদের কাতারে দাঁড় করাতে চান কিংবা নিজের যে কোনো মতামত আলেমদের মতামতের সমতুল্য বলে ঘোষণা দেন! আলেম হতে কারও বাধা নেই, কিন্তু আলেম না হয়ে আলেমদের মতো মতামত দেওয়াতে অবশ্যই বাধা আছে। এটা দুনিয়ার তাবৎ শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইবনে আব্বাস বলেন, 'তাফসির চার প্রকার। প্রথম প্রকার, আরবরা নিজের মাতৃভাষা থেকেই বুঝে নেয়। দ্বিতীয় প্রকার, যে বিষয়ে অজ্ঞতা ওজর হিসাবে ধর্তব্য হবে না। তৃতীয় প্রকার, যা শুধু আলেমরাই জানেন। চতুর্থ প্রকার, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।'[১]

ইবনে আব্বাস এখানে আরব ও আলেমদের বিশেষ গুণ স্বীকার করেছেন। এখন কেউ যদি বলে, এখানে আরবদের পোপতন্ত্র কায়েম করা হয়েছে; একজন আরব যেভাবে আরবি বোঝে, একজন আরবি না-জানা ব্রিটিশও সেভাবে বুঝতে পারেন অথবা তাফসির না-পড়া একজন সাধারণ মানুষও আলেমদের মতো তাফসির বুঝতে পারেন—তা হলে তার কথাটি হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে! বাস্তবতা হল, যারা নিজেকে আলেমদের পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ মনে করাতে চায়, তারা ইলম অর্জনের জন্য কষ্ট স্বীকার না করেই ইলমি গবেষণার কাজ করতে চায়। অথচ আলেমরা যতটা জানেন, তারা ততটাই অজ্ঞ। ইলমের বিষয়ে মুখ খোলার ন্যূনতম শর্তাবলি পূরণ না করেই তারা সামনে এগোতে চায়। এ ক্ষেত্রে আলেমরা বাধা দিলেই শুরু হয় এক পুরনো বুলি আওড়ানো—'ইসলামে পোপতন্ত্র নেই'। ইসলামে পোপতন্ত্র নেই সত্য, কিন্তু একইসঙ্গে ইসলামে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরও কোনো স্থান নেই। কারও অধিকার নেই ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করে হাজার বছরের ইলমি তুরাসকে অস্বীকার করবে কিংবা ফাহমুস সালাফকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে! যারা আলেমদের মতামতকে পোপতন্ত্র বলে উড়িয়ে দিতে চায়, তারা নিজেরাই হয়ে ওঠে একেকজন স্বৈরাচারী পোপ। আলেমদের সকল মতামত নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও তারা নিজেদের মতামতকে ভাবে অলঙ্ঘনীয়। মূলত কথিত পোপতন্ত্র বিরোধিতার আড়ালে নিজেদের পাপতন্ত্র কায়েম করাই তাদের মাকসাদ।

---

১. *তাফসিরে তাবারি*, ১/৭০

ওসাতিয়া বা মডারেট ইসলাম

আজকাল এক শ্রেণির মানুষকে বলতে শোনা যায়, তারা ওসাতিয়া বা মধ্যপন্থি ভারসাম্যপূর্ণ ইসলাম অনুসরণ করেন। তাদের মতে, এই ধারায় কোনো উগ্রতা বা বাড়াবাড়ি নেই। কেউ কেউ একে মডারেট ইসলাম বলেও পরিচয় দেন। মৌলিকভাবে তাদের দাবিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ, ইফরাত-তাফরিত[১] ত্যাগ করে এতেদালের পথ গ্রহণ করাই উত্তম। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, ইসলামের সঙ্গে কেন ওসাতিয়া বা মডারেট শব্দটি যোগ করতে হল? কেন আলাদাভাবে বলতে হচ্ছে, ভারসাম্যপূর্ণ ইসলাম? ভারসাম্যতা ও ইতিদালের ভাব প্রকাশের জন্য ইসলাম শব্দটি কি যথেষ্ট নয়? বরং এই শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার তো পরোক্ষভাবে এই বার্তা দেয় যে, ইসলাম এখন উগ্র ও চরমপন্থি একটি মতবাদে পরিণত হচ্ছে, যাকে পরিশুদ্ধ করতে মডারেটধারা লাগবে!

বাস্তবতা হল, এই চিন্তার প্রবক্তারা মূলত মিডিয়া সন্ত্রাসের শিকার! মিডিয়া প্রতিনিয়ত ইসলাম ও এর অনুসারীদের নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে উপস্থাপন করছে উগ্রবাদী হিসাবে। দেখানো হচ্ছে তাদের অপরাধের খতিয়ান। ইসলামের স্বাভাবিক বিধিবিধানগুলোকে উপস্থাপন করা হচ্ছে বিকৃত ব্যাখ্যাসহযোগে। এই প্রচারণার সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করছেন অনেক ইসলামি চিন্তক। মিডিয়ার অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদেরকে তারা উপস্থাপন করছেন নির্দোষ হিসাবে। উপস্থাপন করছেন ওসাতিয়ার কথা। নিজেদের বলছেন মডারেট। তাদের বক্তব্যের সারকথা হল, ইসলামের অন্যান্য ভার্সনের চেয়ে আমাদের এই ভার্সনটি ভিন্ন। এখানে অভিযোগ করার মতো কিছু নেই। প্রশ্ন হল, তারা যেই ভারসাম্য ও ইতিদালের কথা বলছেন, এটির মর্ম আসলে কী? যদি ভারসাম্যের সীমানা নির্ধারণ করা না যায়, তা হলে সম্ভাবনা আছে, এই ভারসাম্যতার দাবিও প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেবে। সেই প্রান্তিকতার ভিতর জন্ম নেবে চিন্তা ও কর্মের নানা গোমরাহি। তারপর সেগুলোকে বলা হবে, এটাই আসল ইসলাম, এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ইসলাম।

ভারসাম্য বোঝার মূলনীতি হল শরিয়া। এ সংক্রান্ত আলাপে আমাদেরকে শরিয়া সামনে রাখতে হবে। শরিয়া যে সব বিধিবিধান দিয়েছে, সেগুলো যে পালন করে, সেই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে আছে। ভারসাম্যের ধারণা কখনওই

---

১. বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি

ইসলামি শরিয়াবহির্ভূত কিছু নয়, যা শরিয়াতে পাওয়া যায় না। এমন নয় যে, বাহির থেকে কেউ ভারসাম্যের একটি সংজ্ঞা ও মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেবে আর আমরা তা অনুসরণ করে নিজেদেরকে ওসাতিয়াপন্থি বলে পরিচয় দেব। ফলে কুরআন-সুন্নাহতে ফিরে যাওয়াই ভারসাম্য বেছে নেওয়ার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই কথা বললে অনেক সময় এই চিন্তার প্রচারকরা একমত হন না। তারা প্রশ্ন তোলেন, কুরআন-সুন্নাহয় ফিরে গেলেও তো অনেক সময় নানা ইখতেলাফ দেখা যায়, মতভেদ তৈরি হয়, তা হলে সমাধান কী?

এর উত্তর হল, কুরআন-সুন্নাহয় সব বিধান এক স্তরের নয়। কিছু বিধান আছে অকাট্য। এ ক্ষেত্রে যে এই বিধানগুলো শত ভাগ অনুসরণ করে, সেই মুতাদিল বা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আছে। আর যে এ সব বিধান থেকে ডানে-বামে সরে গেছে, সে ভারসাম্যে নেই। তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রান্তিকতা। অপর দিকে যে সব বিধানে ইখতেলাফের সুযোগ আছে, সেখানে যারা ইখতেলাফের উসুল ও আদব মেনে মতভেদ করবে, তারাও ভারসাম্যে আছে। কিন্তু যদি কেউ ইখতেলাফের উসুল ত্যাগ করে বিচ্যুত কোনো মত বেছে নেয়, তা হলে সে ভারসাম্যে নেই।

সমস্যা হল, ভারসাম্য ও মধ্যপন্থার এই আলোচনা প্রায়ই বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। যে কোনো বিষয়ে মাঝামাঝি কিছু একটা বলে দেওয়াকেই মধ্যপন্থা বা ভারসাম্য বলতে চান অনেকে। কিন্তু মাঝামাঝি অবস্থান করলেই তা প্রশংসনীয় হয় না। কুরআন-সুন্নাহয় আমরা দেখি, দু ধরনের মধ্যপন্থার কথা আছে। একটি কাঙ্ক্ষিত, অন্যটি বর্জনীয়। শায়খ ইবরাহিম সাকরান বলেন, 'কুরআন কারিম যে ওসাতিয়া বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলেছে, তা হল দুই বাতিলের মধ্যখানে হক অবলম্বন করা। যেমন—

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো। তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ; তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।[১]

---

১. সুরা ফাতেহা, ৬-৭

কুরআন এখানে আল্লাহর অবাধ্যদের পথ ত্যাগ করে সরল পথ বেছে নেওয়ার কথা বলেছে। অর্থাৎ, যদি দুই পাশেই বাতিলের পথ থাকে, তা হলে দুটির কোনোটিই গ্রহণ না করে মাঝামাঝি অবস্থান করা হল কর্তব্য। এটিই মধ্যপন্থা। এটি প্রশংসনীয় এবং আবশ্যকীয়।

কিন্তু আরেক প্রকারের মধ্যপন্থার নিন্দা করেছে কুরআনুল কারিম। তা হল, হক ও বাতিলের মাঝামাঝি অবস্থান করা। যখন হক ও বাতিল মুখোমুখি হয়, তখন অবশ্যই হক বেছে নিতে হবে। মধ্যপন্থার কথা বলে হক বাতিলের মাঝামাঝি অবস্থান করা যাবে না। কুরআনুল কারিম বলছে—

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣)

দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে! এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না।[১]

এই আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা হক ও বাতিলের কোনোটি গ্রহণ না করে মাঝামাঝি অবস্থান করতে চায়। এই মধ্যপন্থা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। সুতরাং কেউ মধ্যপন্থার কথা বললেই তার পিছু ছোটার কিছু নেই। আগে দেখতে হবে—তার এই মধ্যপন্থা কোন স্তরের! শরিয়া ব্যাখ্যার জন্য তিনি কোন মাধ্যমগুলো গ্রহণ করছেন! নসের ব্যাখ্যার জন্য তিনি কী কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফের বুঝ গ্রহণ করছেন, না আধুনিক নানা মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের বুঝ নসের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন! শরিয়ার বিধানগুলোকে তিনি কি অবিকৃত রেখেই অনুসরণ করছেন, নাকি মধ্যপন্থার নামে এগুলো কাটছাঁট করছেন, বিকৃত করছেন, গুরুত্ব হ্রাস করছেন!

যারা ওসাতিয়া বা মধ্যপন্থার কথা বলেন, অনেক সময় তাদেরকে দেখা যায়, সালাফের বুঝ ও পশ্চিমা চিন্তাদর্শনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে নতুন কিছু নির্মাণ করতে চান। কেউ কেউ তো স্পষ্ট বলেই বসেন—এ যুগে আর সালাফে-সালেহিনের মানহাজ অনুসরণ করার জরুরি নয়। তারা তাদের সময় অনুসারে ইসলামকে বুঝেছিলেন, এখন আধুনিক বিশ্বে আমাদেরকে নতুন

---

১. সুরা নিসা, ১৪৩

করে শরিয়ার বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করতে হবে। পশ্চিমা মতবাদকে শত ভাগ গ্রহণ করা যাবে না, আবার সালাফে-সালেহিনের মানহাজও আঁকড়ে ধরা যাবে না। এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে পারলেই মধ্যপন্থা অর্জিত হবে।

তাদের এই অবস্থানের কারণেই দেখা যায়, পর্দার বিধান থেকে শুরু করে মুরতাদের শাস্তি, শাতেমে রাসুলের শাস্তি, জিহাদের বিধান ইত্যাদি সব কিছু বিকৃত হয়ে এক নতুন রূপ ধারণ করছে। এ ক্ষেত্রে মূল দায় এ সব চিন্তকদের, যারা নিজেদের ভুল চিন্তাকে মধ্যপন্থা নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মধ্যপন্থা মানেই গ্রহণীয় বা বর্জনীয় নয়, বরং সার্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর মূল রূপটি স্পষ্ট হলে তবেই গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

'অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে হবে না'

কেউ যখন সমাজে বিদ্যমান শরিয়াবিরোধী কোনো কাজের বিরোধিতা করে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ঈমান-আকিদাবিরোধী কোনো অবস্থানের সমালোচনা করে—তখন প্রায়ই এই কথাগুলো বলা হয়, 'মানুষের বিষয় আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিন, তিনি ফয়সালা করবেন', 'নিজের আমল নিয়ে আগে চিন্তা করুন', 'আরেকজনের হিসাব আপনাকে দিতে হবে না', 'তার ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন না' ইত্যাদি নানা বাক্যের মাধ্যমে এই চিন্তাটি প্রচার করা হয়। অনেক সময় বলা হয়, 'অন্যের কাজে আপত্তি জানানোর মাধ্যমে তার প্রাইভেসি লঙ্ঘন করা হচ্ছে।'

এই চিন্তার মূল কথা হল, অন্যে কী করছে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই, অন্যের বিষয়ে আমরা দায়বদ্ধ নই। আমরা শুধু নিজেকে নিয়েই চিন্তা করব, নিজের মধ্যেই ব্যস্ত থাকব—এটি একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা। একজন মুসলমান শুধু তার নিজের জীবন নিয়ে নয়, বরং আশপাশে যা ঘটছে, তা নিয়েও দায়বদ্ধ। আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ তো আমাদের দ্বীনেরই অংশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উম্মাহর প্রশংসা করেছেন এই কারণে। এরশাদ হয়েছে—

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে।[১]

যারা আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার করে না, তাদেরকে কুরআনুল কারিম নিন্দা করেছে এই ভাষায়—

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ, كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তরা যে সব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে-অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, তা কতই না নিকৃষ্ট![২]

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, মুনাফিকরা একে-অপরকে সৎ কাজে বাধা দেয় এবং অসৎ কাজে আদেশ দেয়—

اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও সৎ কাজে নিষেধ করে।[৩]

মুমিনদের অবস্থা এর উল্টো। কুরআনুল কারিম বলছে—

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরে বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।[১]

---

১. সুরা আলে ইমরান, ১১০

২. সুরা মায়েদা, ৭৮-৭৯

৩. সুরা তাওবা, ৬৭

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং যারা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। বস্তুত, তারাই হল সফলকাম।[২]

অন্য আয়াতে এসেছে—

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। কিন্তু তারা নয়—যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।[৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের যে কেউ মুনকার কিছু দেখবে—সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে; না পারলে যেন জবান দিয়ে প্রতিবাদ করে; এও না পারলে যেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমান। এর পরে তার মধ্যে আর সরিষা দানা-পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।'[৪] অন্যত্র নবীজি সা. বলেন, 'যার হাতে আমার জীবন নিহিত, তাঁর কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দোয়া করবে, কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না।'[৫]

কুরআন ও হাদিসের এ সব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার আমাদের দ্বীনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে ব্যক্তি আমর

---

১. সুরা তাওবা, ৭১
২. সুরা আলে ইমরান, ১০৪
৩. সুরা আসর, ১-৩
৪. *মুসলিম*, ৫১৩৭
৫. *তিরমিজি*, ২৭৬৩

বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করে, সে মূলত নিজের চারপাশ সম্পর্কে সচেতন। নিজের চারপাশকে সে গুনাহ ও বিপর্যয়ের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে চায়। অপর দিকে যে 'আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে না' বলে দায় এড়াতে চায়, সে মূলত আত্মকেন্দ্রিক। দুই ব্যক্তির মধ্যে বিশাল তফাত। একজন সমাজকে সংশোধন করতে চায়, অন্যজন ঘুণে-ধরা সমাজকে পচনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

এই জন্যই যারা নাহি আনিল মুনকারের সময় 'নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো' ধরনের কথা বলে, হাদিসে তাদের ব্যাপারে সতর্কবার্তা এসেছে। নবীজি সা. বলেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত কথা হল, কেউ যদি বলে, 'আল্লাহকে ভয় করো', তাকে বলা, 'নিজের দিকে তাকাও'।'[১]

'অন্যের কাজ নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে না' কথাটি শুনতে নিরীহ মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। জাগতিক বিষয়ে আমরা দেখি, মানুষ ওই ব্যক্তিকে পছন্দ করে না, যে চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর। আশপাশে রোগী বা অসহায়কে দেখলে কেউ বলে না যে, তার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না, নিজেকে নিয়ে ভাবো। বরং এ সব ক্ষেত্রে যারা অন্যদেরকে নিয়ে চিন্তা করে, তারাই সমাজে প্রশংসিত হয়। কিন্তু দ্বীনি ক্ষেত্রে এলেই দেখা যায়, এর উল্টোটা হচ্ছে! কেউ যদি আশপাশের মানুষের দ্বীনদারিতা নিয়ে চিন্তা করে, তখন তাকে বলা হচ্ছে, আগের নিজের চিন্তা করো। অর্থাৎ, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার থেকে মানুষকে সরাতেই এই কথাগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।

অনেক সময় এই কাজের বৈধতার পক্ষে ১টি আয়াতকে উপস্থাপন করা হয়,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

হে মুমিনগণ, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন হবে। তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।[২]

---

১. *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, ১০৬৮৫
২. সুরা মায়েদা, ১০৫

এই ভুল ধারণার অপনোদন হয়েছে স্বয়ং আবু বকর সিদ্দিক রাজি.-এর ভাষায়। কাইস বিন আবু হাজিম থেকে সহিহসূত্রে প্রমাণিত আছে, আবু বকর সিদ্দিক রাজি. দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন, 'হে মানুষেরা, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও, তবে যে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন হবে। তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

আমি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছি, 'মানুষ যখন মন্দ কাজ হতে দেখেও তা পরিবর্তন করে দেবে না, আল্লাহ তায়ালা তখন এমন আজাব দিতে পারেন, যা তাদের ভালো-খারাপ সবাইকে বেষ্টন করে নেবে।''

মূলত এই আয়াত নিজের ভিতর অবগুণ্ঠিত হয়ে থাকতে বলছে না, মানুষের জন্য ওয়াজিব-পরিমাণ কল্যাণকামিতাকেও ত্যাগ করতে বলছে না, বরং এতে শরয়ি বিধিনিষেধের দায়িত্ব আদায়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে এই বার্তার প্রতি নির্দেশ করে—উম্মাহ এই গুণ হারিয়ে ফেললে যেন আল্লাহর শাস্তির অপেক্ষা করে। আয়াতের উদ্দেশ্য হল, যদি আপনি আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব আদায় করে নেন, অন্যদের কাজ আপনার ক্ষতি করবে না। আপনার উপর আল্লাহ তায়ালা এই দায় দেননি যে, আপনার নিষেধের পরও মানুষ কাজটি না ছাড়লে আপনি গুনাহগার হবেন। এই বিষয়ে আপনার সামর্থ্যও নেই, তাই এই ব্যাপারে আপনি তাকলিফের অধীন নন। আপনি যখন হেদায়েত লাভ করেন, সৎ কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেন, তখন কেউ আপনার কথা অমান্য করলে তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না!

এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা যখন শনিবার দিন ইহুদিদের সীমালঙ্ঘনের ঘটনা উল্লেখ করেন, ঘটনার শেষে এমন এক দল লোকের কথা বলেছেন, যারা নাজাতের উপযুক্ত। সেই দলটি কওমকে আদেশ-নিষেধ করত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ
ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ

অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত, তাদেরকে আমরা উদ্ধার করি। আর যারা জুলুম করেছিল, তাদেরকে আমরা কঠোর শাস্তি দিই। কারণ, তারা পাপাচারে লিপ্ত হত।[১]

হ্যাঁ, এটা সত্য যে, প্রতিটি মুসলমানকেই নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধির বিষয়ে আগে সতর্ক থাকা দরকার। এমন যেন না হয়, সারা দিন অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার কারণে নিজের আমল-আখলাক নিয়ে ভাবার সময়ই পাওয়া গেল না! অন্যের সংশোধনের ফিকিরে নিজের ব্যাপারে গাফেল হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদেরকে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে। দাইর ব্যক্তিগত আমল-আখলাক যদি ভালো না হয়, তা হলে তার দাওয়াতে কোনো প্রভাব থাকে না। তার বক্তব্য হয়ে ওঠে কিছু শব্দ-বাক্যের সমষ্টিমাত্র, যা মানুষের মনে রেখাপাত করে না। অর্থাৎ সবার উচিত অন্যের সংশোধনের পাশাপাশি নিজের ব্যাপারেও ফিকির করা, নিজের জীবনাচার পর্যবেক্ষণে রাখা। কিন্তু এই দিকে গুরত্ব দিতে গিয়ে আমর বিল মারুফ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বৈধ হতে পারে না।

হাসান বসরি রহ. মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহকে বলেন, 'তোমার সাথিদেরকে নসিহত করো।' তিনি বললেন, 'আমার ভয় হয়, নিজে যা করি না অপরকে তার উপদেশ দেব?' হাসান রহ. বলেন, 'আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে সব কথা অনুসারে কাজ করে? শয়তান এটি মাথায় ঢুকিয়ে দেয় মতলব হাসিল করার জন্য। এমনভাবে এই অনুভূতি মনে ঢুকিয়ে দেয়, যেন কেউ সৎ কাজের আদেশ না করে, গর্হিত কাজ থেকে বাধা না দেয়।'[২]

রবিআ বিন আবু আবদুর রহমান বলেন, আমি সাইদ বিন জুবায়েরকে বলতে শুনেছি, 'যদি মানুষ নিজেকে শুধরানোর আগে ভালো কাজের আদেশ না করে, মন্দ কাজ থেকে বাধা না দেয়, তবে কেউই সৎ কাজে আদেশ করতে

---

১. সুরা আরাফ, ১৬৫
২. *তাফসিরে কুরতুবি*, ১/৩৬৭

পারবে না, অসৎ কাজে নিষেধ করতে পারবে না।' ইমাম মালেক বলেন, 'তিনি সত্য বলেছেন। কে আছে, যার কোনো গুনাহ নেই!'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্থির থাকে এবং যে সীমা লঙ্ঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মতো, যারা লটারির মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপরতলায় আর কেউ নিচতলায়। পানির ব্যবস্থা ছিল উপরতলায়। কাজেই নিচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে উপরতলার লোকদের ডিঙিয়ে যেত। তখন নিচতলার লোকেরা বলল, 'উপরতলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিই, তবে ভালো হয়।' এমতাবস্থায় তারা যদি নিচতলার লোকদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয়, তা হলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের বিরত রাখে, তবে তারা এবং অন্যরা সকলেই রক্ষা পাবে।'[১]

বিশ্বাসে ঘুণেপোকা

'নিজেকে আবিষ্কার করা' বলে একটা কথা আছে। অর্থাৎ, নিজের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি এখনও নিজেকে আবিষ্কার করতেই ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি কী সেক্যুলারিজমের পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছেন, না ইসলামের পাটাতনে, না অন্য কোনো বিশ্বাসের—তা তিনি নিজেই ঠাহর করতে পারেন না! তাই দেখা যায়, ইসলামে বিশ্বাসী হয়েও অনেকে ইসলামের মৌলিক কাঠামোর বাইরে সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেন। এ ক্ষেত্রে তারা এতটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন যে, সামান্য বিরোধিতাও তারা সহ্য করতে চান না। নিজের সিদ্ধান্তকে ভারসাম্যপূর্ণ দাবি করে বিরোধীদের প্রান্তিক, গোঁড়া, মূর্খ ইত্যাদি বলে বসেন তারা।

সমাজে বহুল প্রচলিত এ ধরনের একটি আচরণ হল, মৃত কাফেরের আত্মার জন্য শান্তি কামনা করা; কাফেরও আল্লাহর রহমত পেতে পারে বলে ঘোষণা করা। সাধারণত সেলিব্রেটি কাফেরদের (বা স্বঘোষিত নাস্তিকদের) মৃত্যুর পর এই কথাগুলো খুব প্রচার হতে দেখা যায়। কোনো কাফের বা নাস্তিকের মৃত্যু হলে সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীরা তার আত্মার শান্তি কামনা করে, একই সময় সেক্যুলারদের অনুকরণে সাড়া দিয়ে ওঠে মুসলিম-সমাজের

---

১. প্রাগুক্ত

আত্মপরিচয়হীন একটি গোষ্ঠী। তাদের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর, তবে বেশ স্পষ্ট। তাদের বক্তব্যের সারকথা হল, আল্লাহর রহমত অনেক প্রশস্ত। কাফেরকে মাফ করার বিষয়টি তাঁর ইচ্ছাধীন; তিনি চাইলে মাফ করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে আমরা কিছু বলার অধিকার নেই। যেহেতু বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তাই তাঁর কাছে মৃত কাফেরের জন্য দোয়া করতেও সমস্যা নেই।

যদি তাদের কথার প্রতিবাদ করা হয় কিংবা বলা হয়, কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কেউ আল্লাহর রহমত পাবে না, তা হলে তারা বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণত তারা স্বগোত্রের মুসলমানদের সঙ্গে তির্যক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন, যদিও কাফেরদের বিষয়ে তাদের অবস্থান খুবই নমনীয়। মুসলিম-সমাজের এই শ্রেণিটি খুব গৎবাঁধা কিছু কথাবার্তা বলে থাকেন। তাদের মতে, আল্লাহর রহমত আল্লাহ কাকে দেবেন আর কাকে দেবেন না, সেটা আল্লাহর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এখানে অন্য কারও মাতবরি করার সুযোগ নেই।

মৌলিকভাবে কথাটি সঠিক। অবশ্যই আল্লাহর রহমত বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ নিজেই সিদ্ধান্ত নেন। এখানে অন্য কেউ কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারে না। তবে আল্লাহর রহমত কারা পাবে, তা আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন—

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

আর আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এ রহমত (পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, জাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে। (আরাফ, ১৫৬)

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (সুরা হুজুরাত, ১০)

এই আয়াতগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তাঁর রহমত মুমিনদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। এবার দেখা যাক, কাফেরদের ক্ষেত্রে তিনি কী বলেছেন। কাফেরদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। (সুরা আহজাব, ৬৪)

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অবলম্বন করতে চায়, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুরা আলে ইমরান, ৮৫)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সুরা আনকাবুত, ২৩)

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

অতএব কাফেরদের জন্য রয়েছে আল্লাহর লানত। (সুরা বাকারা, ৮৯)

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট, কাফেরদের জন্য আল্লাহ পরকালে নিজের রহমত বণ্টন করবেন না। একই সঙ্গে কাফেরদের ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থনা কিংবা দোয়া করার বিষয়টিও আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করেছেন এভাবে—

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(হে নবী,) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, একই কথা। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে কুফরি করেছে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত করেন না। (সুরা তাওবা, ৮০)

সবগুলো আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন কাফেরদের ব্যাপারে বিশ্বাস কী হবে এবং মৃত কাফেরের সঙ্গে আচরণ কী হবে। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করছেন—কাফের ব্যক্তি আল্লাহর রহমত পাবে না এবং মৃত কাফেরের জন্য দোয়া করা না করা সমান, তাতে তার কোনোই উপকার হবে না।

এখন কেউ যদি কোনো বিধর্মীর ইন্তেকালে বিষয়গুলো অন্যদের স্মরণ করিয়ে দেয়, তা হলে তিনি কুরআনি নির্দেশনা প্রচার করছেন মাত্র; কে আল্লাহর রহমত পাবে বা না পাবে, সে বিষয়ে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। অপর দিকে যারা বলছে 'আল্লাহর রহমত প্রশস্ত, তিনি চাইলেই কাফেরকে ক্ষমা করতে পারেন', তারা ভুলে যাচ্ছে, আল্লাহ নিজেই বলেছেন, কাফের তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বোঝা গেল, এই লোকেরাই মূলত আল্লাহর রহমত কে পাবে আর কে পাবে না, সে ক্ষেত্রে নিজেরা মাতবরি করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। যদি সে বাস্তবেই বিশ্বাস করে থাকে, আল্লাহর রহমত কোনো মাখলুকের হাতে নেই, তা হলে তার এটাও বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহ নিজেই বলেছেন—তাঁর রহমত তিনি কোনো কাফেরকে দেবেন না।

অথচ দেখা যায়, এই শ্রেণিটি প্রথম বিষয়টি বিশ্বাস করে (অন্তত মৌখিক স্বীকৃতি দেয়), কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়ে এসে তারা বলে থাকে, আল্লাহ চাইলে কাফেরকেও রহমত করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে তারা কাফেরদের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্ম ইত্যাদির দলিল টেনে বলে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর এ সব ভালো কাজের বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করতে পারেন। অথচ আল্লাহর নিষেধসত্ত্বেও তার কাছে কাফেরদের জন্য রহমত প্রার্থনা করা নিঃসন্দেহে হারাম ও সীমালঙ্ঘন। এই সীমালঙ্ঘন জায়েজ নয়। ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'দোয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন হল, বান্দা আল্লাহ তায়ালার কাছে এমন কিছু চাওয়া, যা তিনি করবেন না। যেমন, নবীদের স্তর প্রার্থনা করা। অথচ সেই দোয়াকারী নবী নয়। অথবা কাফেরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।'[১]

'আল্লাহর রহমত বণ্টন আল্লাহর নিজস্ব সিদ্ধান্ত' এই কথা বলে তারা নিজেরাই কাফেরের উপর সেই রহমত বণ্টনের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে? এ ধরনের লোকদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

---

১. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ১/৩২৫

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? (সুরা জুখরুফ, ৩২)

'আলেমরা শরিয়তের খোসা নিয়ে পড়ে আছে'

কথা হচ্ছিল সাম্প্রতিক এক প্রসঙ্গে। নানা ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছিল। উপস্থিত একজন আলেম ফিকহি পর্যালোচনাও উপস্থাপন করলেন। এতেই ক্ষেপে গেলেন একজন। তীব্র সুরে বললেন, 'আপনাদের কাজই এটা। সব সময় শরিয়ার আবরণ নিয়ে পড়ে থাকা! আপনাদের এ সব কথা মেনে নিলে মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতির কোনো আবেদনই আর থাকে না।'

কথাটা শুনে অবাক হলাম! সাধারণত এ ধরনের কথা ভ্রান্ত সুফিবাদী লোকজনের মুখেই বেশি শোনা যায়। তাদের বেদআতি-শিরকি কর্মকাণ্ডের ফিকহি পর্যালোচনা উপস্থিত করলে তারা বলেন, 'এ সব শরিয়তের আবরণ ও বাহ্যিক কথাবার্তা। এতে ইসলামের মূল রুহ নেই। এ সব উলামায়ে জাহেরদের কাজ। বাহ্যিক খোলস আঁকড়ে ধরাই তাদের নীতি।'

অবাক করা বিষয় হল, আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি সুফিধারার নন, বরং নিজেকে চিন্তায় আধুনিক মনে করেন। তার এ ধরনের কথা বলার উদ্দেশ্য কী? সাধারণত এ ধরনের কথা বলা হয় নিজেকে ফিকহের নজরদারি থেকে রক্ষা করতে। ফিকহের নজরদারি মেনে নিলে হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা চলে আসে। এর চেয়ে ফিকহকে বাহ্যিক জ্ঞান, শরিয়ার খোলস বা আবরণ বলে অকার্যকর ঘোষণা করলে নিজের কাজের বৈধতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। ফিকহকে শুষ্ক জ্ঞান বলে এড়িয়ে যেতে পারলে নিজের মনের খাহেশাতকেও বাজারজাত করা যায় মাকাসিদে শরিয়ার নাম দিয়ে। ভ্রান্ত সুফিরা যেভাবে নিজের খাহেশাতকে 'ইলমে বাতেন' বলে বৈধ করার চেষ্টা চালায়, তেমনি আধুনিক অনেক চিন্তকরাও ফিকহের নজরদারি এড়িয়ে নিজেদের ফিকরি বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালান। এ ক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে তারা আলেম, মুফতি ও ফকিহদের কটাক্ষ করে বলেন, 'আরে, এরা তো শরিয়ার খোলস নিয়ে পড়ে আছে।'

অনেকের কাছে এ ধরনের কথাবার্তা উঁচু দরের বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় হলেও বাস্তবে এতে শরিয়ার কিছু বিধান ও হুকুমের প্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়। এ

ধরনের উপস্থাপনে মনে হয়, কোনো কিছুর খোলস বা আবরণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, বরং ভিতরের জিনিসটিই আসল, তেমনি শরিয়ার কিছু বিধান ও হুকুম আছে, যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ কথা সত্য, শরিয়ার সকল বিধান এক স্তরের নয়। মুস্তাহাব আর ফরজের স্তর এক নয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এখানে কোনো কিছুর অবজ্ঞা করা যাবে, অবহেলা করা যাবে। শরিয়ার প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন নফল ও মুস্তাহাব আমলসমূহ ওয়াজিব আমলের ঘাটতি পূরণ করে। এক হাদিস থেকে জানা যায়—কেয়ামতের দিন বান্দার ফরজ সালাতে যদি কোনো অপূর্ণাঙ্গতা থাকে, তা হলে আল্লাহ বলবেন, 'আমার বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কি?' যদি থাকে, তা হলে তা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে।

এ থেকে বোঝা যায়, আমলের ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাস থাকলেও এখানে কোনো কিছুই গুরুত্বহীন নয়, বরং প্রতিটি বিষয় গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ। এখানে কোনো কিছুকেই হেলা করা বা অবহেলার সুযোগ নেই। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের শাখা সত্তরটির কিছু বেশি কিংবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই' এ কথা স্বীকার করা এবং সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো'।'

এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে, কষ্টদায়ক বস্তু সরানো স্তরের দিক থেকে নিচে অবস্থান করছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই কাজটিকে তুচ্ছ করা যাবে কিংবা কেউ এই কাজ করলে তাকে বলা হবে—আরে, তুমি তো খোলস নিয়ে পড়ে আছ! অর্থাৎ, শরিয়ার বিভিন্ন বিধানের মধ্যে স্তরগত তারতম্য থাকতেই পারে, কিন্তু এই কারণে কোনো বিধানকে তুচ্ছ করার বা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।

অনেককে দেখা যায়, তারা নিজেদের খাহেশাতের বিপরীত যে কোনো কিছুকেই বাহ্যিক আরবণ বলে ঘোষণা দেন। যেন চাইলেই এ সব ছেড়ে দেওয়া যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি কোনো কিছু থেকে নিষেধ করলে তোমরা তা বর্জন করবে। আমি তোমাদের কোনো নির্দেশ দিলে যথাসাধ্য তা পালন করবে।'

সাধারণত বিপত্তি বাধে ফিকহি নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রেই। ফিকহি নিষেধাজ্ঞা এলেই এক দল দাবি করে, তারা শরিয়তের মূল নির্যাস নিয়ে আছে, অন্যরা আছে খোলস নিয়ে। এ প্রবণতা নতুন নয়। শায়খুল ইসলাম ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস সালামের যুগেও এ প্রবণতা ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'শরিয়াকে খোসা বলা যাবে না। এটি জায়েজ হবে না। আনুগত্যের নির্দেশ কী করে খোসা হয়। মূর্খ ও বেয়াদব ছাড়া কেউ এই বিশেষণ ব্যবহার করবে না। তাদের কাউকে যদি বলা হয়, তোমার শায়খের কথাগুলো খোসা, তা হলে সে এটি মেনে নেবে না। অথচ শরিয়ার ক্ষেত্রে সে ব্যবহার করে খোসা শব্দ।'

একই ধরনের কথা বলেছেন ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকি রহ.-ও। যারা এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করে, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তাদের উদ্দেশ্য যদি ফোকাহায়ে কেরাম হয়, তা হলে এগুলো খোসা নয় বরং মগজ। যে এ সব সম্পর্কে খোসা শব্দ ব্যবহার করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত।'

ইন্টারফেইথ : রঙিন বোতলে পুরনো বিষ

ইন্টারফেইথ মানেই সর্বধর্ম মিলন বা ওয়াহদাতুল আদইয়ান নয়। ইন্টারফেইথে কেউ অংশ নেওয়া মানেই তিনি সব ধর্ম মিলিয়ে এক ধর্ম বানাতে চাচ্ছেন, ব্যাপারটা এমন না। ইন্টারফেইথে যারা অংশ নেন, তারা মূলত ধর্মগুলোর মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি ও দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করেন। পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করাই তাদের উদ্দেশ্য থাকে। এ জন্য কেউ ইন্টারফেইথে অংশ নিলেই তিনি সব ধর্ম এক বানাতে চাচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলাটা বাড়াবাড়ি।

সর্বধর্ম মিলন বা ওয়াহদাতুল আদইয়ানের কুফর নিয়ে তো কারও কোনো দ্বিধা নেই। এতে সবাই একমত। কথা হল, সম্প্রীতি গড়া ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত ইন্টারফেইথ নিয়ে। বাহ্যিকভাবে এতে কোনো সমস্যা দেখা যায় না। কারণ, এখানে শুধু ধর্মগুলোর মৌলিক শিক্ষা নিয়ে কথা হবে, পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি দূর করা হবে। কারও ব্যাপারে কারও কোনো প্রশ্ন ও আপত্তি থাকলে তা দূর হবে।

সমস্যা হল, বিষয়গুলো বলতে যত সহজ, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ততটাই কঠিন। ইন্টারফেইথের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এক টেবিলে বসার আগে মৌলিক কিছু বিষয়ে একমত হতে হয় বা একমত না হলেও অন্তত মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হয়! মূলনীতিতে একমত না হলে বা স্বীকৃতি না দিলে আলাপই এগোনো যাবে না। সুতরাং ইন্টারফেইথের ভিতরে যা-ই আলোচনা হোক, এই মূলনীতিতে একমত হওয়া বা মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। এই মূলনীতিগুলোই মূলত অনেক বিকৃতির দুয়ার খুলে দেয়। মোটা দাগে এমন দুয়েকটি মূলনীতি দেখা যাক।

১। সকল ধর্মের মৌলিক শিক্ষায় কোনো উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি নেই। ধর্মের মূল শিক্ষায় আছে শান্তি ও সম্প্রীতি। তাই সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে আমাদেরকে প্রত্যেক ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে।

ইন্টারফেইথে যারা অংশ নেন, তারা সবাই ঘুরেফিরে এই কথাই বলেন। উপস্থাপন এদিক-সেদিক হতে পারে, মূল বক্তব্য একই। কারণ, এই কথায় একমত না হলে বা স্বীকৃতি না দিলে আলাপই এগোবে না। সমস্যা হল, এই মূলনীতিতে বড় তিনটি সমস্যা রয়ে যায়। প্রথমত, ইসলাম বাদে প্রতিটি ধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। এতটাই বিকৃত হয়েছে যে, সেগুলোর মূল রূপে আর ফেরারই অবস্থা নেই। ফলে কেউ যখন কোনো খ্রিষ্টান বা ইহুদিকে তার ধর্মের মূল শিক্ষায় ফিরে যেতে বলে, তা মূলত অবাস্তব কল্পনা। অন্যদেরকে তাদের ধর্মের মূল রূপে ফেরাতে না পেরে শেষে তাদের বর্তমান রূপের কোনো একটা অংশকেই প্রকৃত শিক্ষা স্বীকৃতি দিয়ে তা ব্যাপক করার আহ্বান জানানো হয়। যেমন, বছর দুয়েক আগে জনৈক খ্যাতিমান শায়খ তার এক আলোচনায় বলেছিলেন, 'মসজিদের মিম্বর ও ওয়াজ-মাহফিলে অন্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে।' (বিরোধিতার উদ্দেশ্যে নয়, বরং ধর্মগুলোর মধ্যে বিভেদ কমাতে।)

দ্বিতীয়ত, শান্তি ও সম্প্রীতির সংজ্ঞা নির্ধারণে জটিলতা। শান্তি ও সম্প্রীতির মাপকাঠি ও সীমা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু ইন্টারফেইথে আপনি সে কথা বলে লাভ নেই। সেখানে আপনাকে এমন কথাই বলতে হবে, যা অপর পক্ষও মেনে নেয়। ফলে সাধারণত শান্তির সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রচলিত হিউম্যান রাইটসের মতো ফালতু মতবাদকে মূল বানানো হয়। ফলে ইন্টারফেইথ যখন বলে 'সব ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ধর্মের পাবন্দ হলেই দুনিয়া থেকে উগ্রতা হানাহানি দূর হবে', তা একটা ভাঁওতাবাজিমাত্র!

তৃতীয়ত, ধর্ম শুধু ভালোবাসা ও সম্প্রীতিই শেখায় এই বলে ঘৃণার ক্ষেত্রগুলোও আড়াল করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে মুসলিম-সমাজের অনুসরণীয় কেউ যদি ইন্টারফেইথে এ সব বলে বসেন, তা হলে সাধারণ মুসলমানদের বড় অংশ কুফরের প্রতি ঘৃণা হারিয়ে ফেলে। সে ঈমান ও কুফরকে এক গাছের দুই ডাল ভেবে বসে!

২। ইসলামের জিহাদ বিধান নিয়ে হীনম্মন্যতা।

অমুসলিম বা ওরিয়েন্টালিস্টদের জিহাদ-সংক্রান্ত আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে মুসলিম লেখকদের অনেকে এক প্রকার হীনম্মন্যতার শিকার হয়েছেন। তাদের কেউ কেউ 'ইকদামি জিহাদ'কেই অস্বীকার করে বসেছেন! কারণ, আত্মরক্ষামূলক জিহাদের পক্ষে যুক্তি দিলে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও একমত হবে,

যেহেতু প্রয়োজনে সবাইকেই যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য ইকদামি জিহাদের পক্ষে যা-ই বলা হোক, অপর পক্ষ মেনে নেবে না। যেহেতু ইন্টারফেইথের উদ্দেশ্যই সবাইকে কথিত উগ্রবাদের বিরুদ্ধে এক প্ল্যাটফর্মে আনা এবং দূরত্ব কমানো, ফলে এখানেও জিহাদের বিধান নিয়ে শুরু হয় অস্পষ্টতা। ধর্মের জন্য জিহাদ করা উচিত নয় বা ইসলামও এই কাজ সমর্থন করে না, বলে দেওয়া হয়। যেমন কয়েক বছর আগে এক ইন্টারফেইথে জনৈক বিখ্যাত আলেম বলেছেন, 'ধর্মগুলোর শুরুর দিকের লোকজন ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখতেন। ফলে তাদের মধ্যে কোনো হানাহানি, বিভেদ ছিল না।' নবীজির সিরাত যারা পড়েছেন, তারা সহজেই এই বক্তব্যের সমস্যা ধরতে পারবেন।

ইন্টারফেইথ জিহাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার বদলে 'উগ্রতা' বলে দেয় অনেক সময়!

৩। অন্য ধর্মগুলোর কুফর সম্পর্কে অস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান।

ইন্টারফেইথ কোনো দাওয়াতি প্রোগ্রাম নয়, যেখানে একজন দাই নিজের দাওয়াহ স্পষ্ট করবেন। বরং মোটা দাগে ইন্টারফেইথ হল নিজের দাওয়াহকে অস্পষ্ট করার প্রোগ্রাম। বিগত বছরগুলোতে যে সব ইন্টারফেইথ হয়েছে, তার ভিডিও দেখুন, আলোচনাগুলো পর্যালোচনা করুন, দেখবেন—যেখানেই একটু স্পর্শকাতর আলোচনা এসেছে, আলোচকরা শরিয়ার অবস্থান স্পষ্ট করার পরিবর্তে অস্পষ্ট করেছেন। ইন্টারফেইথে আপনি সব মতবাদকেই ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। সব ধর্মের প্রবর্তকরাই ইন্টারফেইথে আল্লাহর প্রেরিত নবী। এখানে গৌতম বুদ্ধকেও 'মহাত্মা' বলতে হবে!

ইন্টারফেইথ যেই ধর্মের সঙ্গেই হোক, এই কয়েকটি কমন বক্তব্যের হেরফের হবে না। আর একবার যখন এ সব মূলনীতি মেনে আলাপ শুরু হয়, তখন দ্বীনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখাতেও শুরু হয় বিকৃতি। যত সময় যাবে, বিকৃতির সংখ্যা ও পরিমাণ তত বাড়তে থাকবে। বিশেষ করে অনুসরণীয় কেউ যখন এগুলোয় যান, তখন অনুসারীদের মধ্যেও বিকৃতি ব্যাপক হতে থাকে এবং কয়েক দশক পর তার এ সব ভুলকেই দলিল বানানো হয়। ফলে ইন্টারফেইথ যে রূপেই আসুক, তা সহজ কিছু নয়। ইন্টারফেইথ ঘরে ঢোকে সুই হয়ে, কিন্তু বের হয় অজগর হয়ে!

'বিকল্প কী'

'বিকল্প কী'—সমাজে বিদ্যমান কোনো খারাপ কাজের বিষয়ে সতর্ক করা হলে সাধারণত এই প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নকর্তাদের দাবিমতে মনে হয়, বিকল্প দেওয়ার আগ পর্যন্ত খারাপ কাজে বাধা দেওয়াও ঠিক নয়! সাধারণভাবে প্রশ্নটি ভুল নয়। কারণ, অপরাধ থেকে ফেরানোর জন্য কল্যাণের দরজা খোলা রাখাই উত্তম। তা হলে আর মানুষের মন্দ পথ বেছে নেওয়ার সুযোগই থাকবে না। মানুষ যদি উত্তম পথের সন্ধান না পায়, তা হলে সে মন্দ পথই বেছে নেয়। এ ক্ষেত্রে নসিহত করে লাভ হয় না। অসৎ কাজের বিকল্প সৃষ্টি করলে তার প্রতি ঝোঁক কমে যায়, আগ্রহেও ভাটা পড়ে। এ সব দিক বিবেচনায় বিকল্প সৃষ্টি করা মন্দ নয়।

নবীজির সিরাতেও আমরা দেখি নবীজি সা. প্রায়ই কোনো বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে বিকল্প বলে দিতেন। যেমন :—

১। একবার বেলাল রাজি. রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট উন্নত মানের বারনি খেজুর নিয়ে উপস্থিত হন। নবীজি সা. বলেন, 'এই খেজুর কোত্থেকে?' বেলাল রাজি. বলেন, 'আমাদের কাছে কিছু নিম্ন জাতের খেজুর ছিল। আমরা সেগুলোর দুই সা বিক্রি করে তার বিনিময়ে এক সা ক্রয় করেছি, যেন রাসুলুল্লাহ সা.-কে খাওয়াতে পারি।' রাসুলুল্লাহ সা. বলে ওঠেন, 'হায় হায়, এটিই তো সুদ, এটিই তো সুদ! এমন করো না। তবে এভাবে কিনতে চাইলে, প্রথমে ভিন্ন চুক্তিতে খেজুর বিক্রয় করবে, তারপর ভালো খেজুর কিনে নেবে।'[১]

২। আনাস ইবনে মালিক রাজি. বলেন, 'জাহেলি যুগে লোকেরা দুটি দিনে খেলাধুলা করত। নবী সা. মদিনা আগমন করে বললেন, 'তোমাদের খেলাধুলা ও আনন্দের জন্য দুটি দিন ছিল। আল্লাহ তায়ালা তার পরিবর্তে তোমাদেরকে আরও দুটি দিন দিয়েছেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা।'[২]

---

১. *বুখারি*, ৩৫৬২

২. *মুসনাদে আহমদ*, ২১৪৩৫

৩। নবীজি সা. বলেন, 'তোমরা বলো না, 'আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চায়'। বরং বলো, 'আল্লাহ যা চান, তারপর অমুক যা চায়'।'[১]

৪। নবীজি সা. বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন গোলামকে না বলে—'তোমার প্রভুকে খাবার দাও, তাকে উজু করাও, তাকে পানি পান করাও'। বরং যেন বলে—'তোমার মনিব, তোমার অভিভাবক'। কেউ যেন না বলে, 'আমার দাস, আমার দাসী'। বরং যেন বলে, 'আমার বালক, আমার বালিকা, আমার গোলাম'।'[২]

৫। নবীজি সা. বলেন, 'কোনো বিপদ আসলে বলো না, 'যদি আমি এটি করতাম তা হলে এমন এমন হত'; বরং বলো, 'আল্লাহ যা তাকদিরে রেখেছেন তা হয়েছে, তিনি যা চান, তা-ই করেন'।'[৩]

কুরআনুল কারিমেও আমরা দেখি আল্লাহ তায়ালা ভুলের বিষয়ে সতর্ক করে বিকল্প শুদ্ধ পথটি নির্দেশ করছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

হে মুমিনগণ, 'রাইনা' বলো না, বরং 'উনজুরনা' বলো এবং শুনে রাখো, কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৪]

সাহাবিদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, তারা অনেক সময় বিকল্প তৈরি করে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রাজি.-এর নিকট এক লোক এসে বলল, 'হে ইবনে আব্বাস, আমি হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করি। আমি ছবি আঁকি।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'আমি কেবল একটি হাদিস শোনাব তোমাকে, নবী সা.-কে বলতে শুনেছি—'যে ব্যক্তি কোনো ছবি তৈরি করবে, তাকে সেই ছবিতে রুহ ফুঁকে না দেওয়া পর্যন্ত আজাব দেওয়া হবে। আর সে কখনওই এটি করতে সক্ষম হবে না।' লোকটি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। তার চেহারা হলুদ হয়ে গেল। ইবনে আব্বাস রাজি. তাকে বললেন,

---

১. *আবু দাউদ*, ২৪১৩
২. *বুখারি*, ১৮৭২
৩. *মুসলিম*, ১২৩০
৪. সুরা বাকারা, ১০৪

'তোমার ধ্বংস হোক, যদি করতেই চাও, তা হলে এই গাছের ছবি আঁকো। প্রাণ নেই এমন সব ছবি আঁকো।'[১]

ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'ফতোয়া-প্রদানকারীর মধ্যে ফিকহ ও কল্যাণকামিতা থাকার একটি লক্ষণ হল, প্রশ্নকারী তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করার পরে সে যদি নিষেধ করে, এ দিকে ফতোয়াগ্রহীতার যদি সেই কাজ করার প্রয়োজন থাকে, তা হলে তাকে সেই হারাম কাজের বিকল্প দেখিয়ে দেবে। এতে হারামে লিপ্ত হওয়ার পথ তার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। খুলে যাবে মুবাহের দরজা। এটি করতে পারেন কেবল সেই হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহমর্মী আলেম, যার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তার ইলম অনুযায়ী আল্লাহ তার সঙ্গে ব্যবহার করবেন। অজস্র আলেমের ভিড়ে তিনি ডাক্তারদের মধ্যে থাকা জ্ঞানী হিতাকাঙ্ক্ষী ডাক্তারের মতো। সে রোগীকে যেমন ক্ষতিকর বস্তু থেকে দূরে রাখে, তেমনি তার জন্য উপকারী বস্তুসমূহের পরামর্শ দেয়। দ্বীন ও শরীর উভয় ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা তেমন। ফকিহগণ দ্বীনের ডাক্তার।'[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিছু মানুষ রয়েছে, যারা অকল্যাণের পথ বন্ধ করে কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়, আর কিছু মানুষ কল্যাণের পথ বন্ধ করে অকল্যাণের দ্বার খুলে দেয়। সুসংবাদ তাদের জন্য, কল্যাণের চাবিকাঠি আল্লাহ যাদের হাতে দিয়েছেন। আর ধ্বংস তাদের জন্য, অকল্যাণের চাবিকাঠি আল্লাহ যাদের হাতে দিয়েছেন।'[৩]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, যারা বৈধ ও শরিয়াসম্মত বিকল্প তৈরি করে চলেছেন, আশা করি, তারা নবীজির সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বিকল্প খোঁজা নিন্দনীয় নয়, বরং নানা প্রেক্ষাপটে এটি জরুরি বিষয়। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'আল্লাহ মানুষের জন্য যা হারাম করেছেন, তার বিকল্প হিসাবে আরও উত্তম হালাল দান করেছেন। যেমন, তিরের মাধ্যমে ভাগ্য অন্বেষণ হারাম করে বিকল্প হিসাবে দিয়েছেন ইস্তিখারার দোয়া। সুদ হারাম করে তার বিকল্প দিয়েছেন লাভজনক ব্যবসা। জুয়া হারাম করেছেন, কিন্তু তির, উট ও ঘোড়ার মাধ্যমে দ্বীনের কাজে উপকারী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হালাল কামাই

---

১. *বুখারি*, ৩২৭৬

২. *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন*, ৪/১২২

৩. *ইবনে মাজা*, ১২০৯

করার সুযোগ দিয়েছেন। রেশম হারাম করেছেন, বিকল্প দিয়েছেন সুতা, কাতান ও উল ইত্যাদি নানা জাতের উন্নত পোশাক। ব্যভিচার ও সমকামিতা হারাম করেছেন, হালাল করেছেন বিয়ে ও সুন্দরী নারীদেরকে স্ত্রী বা দাসী হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ। নেশাদ্রব্য পান করাকে হারাম করে হালাল করেছেন শরীর ও মনের জন্য উপকারী পানীয়সমূহ। ঢোল-তবলা ও গানের নিষিদ্ধ উপকরণসমূহ হারাম করে বিকল্প রেখেছেন কুরআনের পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর তেলাওয়াত শ্রবণ। খারাপ খাবারসমূহ হারাম করেছেন এবং হালাল করেছেন উত্তম খাবারসমূহ।'[১]

সার্বিকভাবে বিকল্প খোঁজায় সমস্যা নেই। এটা কোনো ভ্রান্তির দিকেও নিচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তখন, যখন মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিকল্প সন্ধান করে এবং বিকল্প না থাকার অজুহাতে খারাপ কাজটিতে লিপ্ত হয় কিংবা বিকল্প বের করার নামে আরেকটি খারাপের সূচনা করে। যেমন কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিকল্প না থাকার অজুহাতে খারাপ কাজকেই বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সহজে বলা হয়, এ ছাড়া কিছু করার ছিল না! এর তো কোনো বিকল্প নেই। অথচ এটি কোনো যুক্তিই হতে পারে না। আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কিছুকে বিকল্প না পাওয়ার অজুহাতে গ্রহণ করা যেতে পারে না। বিকল্প থাকলে হারাম থেকে বাচা সহজ হয় সত্য, কিন্তু তাই বলে বিকল্প না পেলে হারাম করাটা বৈধ হয়ে যায় না।

দ্বিতীয়ত, প্রায়ই দাইদের কাজকে বাধা দেওয়ার জন্য বিকল্পের আলাপ টানা হয়। কেউ হয়তো কাউকে গুনাহ থেকে সরতে বলছে, তখন তাকে বলা হয়, 'বিকল্প দাও।' বিকল্প না দিলে 'নাহি আনিল মুনকার' করা যাবে না! অথচ নাহি আনিল মুনকারের জন্য বিকল্প দেওয়া জরুরি নয়। কাজটি শরিয়তে নিষিদ্ধ হলেই হয়।

তৃতীয়ত, যারা বিকল্পের সন্ধান করে, তারা সাধারণত সমপর্যায়ের বিকল্পই চায়। তাদের মনমতো না হলে বিকল্প পেলেও প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু বিকল্পের বাস্তবতা হল, এটি কখনওই মূলের মতো নয়। জিনার বিকল্প হিসাবে বিবাহ এসেছে; কিন্তু বিবাহে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, যা জিনার ক্ষেত্রে নেই। এখন কেউ যদি বলে, হুবহু জিনার মতোই বিকল্প লাগবে, তা হলে এটি হবে

---

১. *রওজাতুল মুহিব্বিন ওয়া নুজহাতুল মুশতাকিন*, ১৮

বোকামি। এ জন্য আমাদেরকে বিকল্পের বাস্তবতা বুঝতে হবে। বিকল্পকে বিকল্পের স্থানেই রাখতে হবে।

চতুর্থত, অনেক সময় হারামের বিকল্প হিসাবে উল্টো আরেক হারামকে বেছে নেওয়া হয়। ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'একজন শায়খ আমাকে বলেছেন, পারস্যের এক রাজা একজন সুফিকে একটি বড় সামা গানের মজলিস কায়েম করে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'হে শায়খ, এই যদি হয় জান্নাতের পথ, তা হলে জাহান্নামের পথ কোনটি?' মজলিসটি হারাম সামা গানের ছিল।'[১]

বিকল্প খোঁজা বা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বিকল্পটি কে দেবেন, তা নির্ধারণ করা। আজকাল তো যে কেউ এ বিষয়ে মুখ খুলছে! কোনো সমস্যা সামনে এলেই হল, পাঁড় সেক্যুলারও অনায়াসে বলে দিচ্ছে, এই বিষয়টি ইসলামে নাজায়েজ নয়, বিকল্প হিসাবে করা যেতেই পারে! অথচ বাস্তবতা হল, সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, আলেমদের মধ্যেও সবাই এই কাজের যোগ্য নন। বিকল্পের ধারণাটি সবার কাছে স্বচ্ছ নাও থাকতে পারে। তার জানাশোনা ও অভিজ্ঞতার কমতি থাকতে পারে। এ জন্য দরকার অভিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ফকিহ, যিনি সমকালীন বাস্তবতাকে শরিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করে বিকল্পের সন্ধান দেবেন।

স্বীকার করতেই হবে, পাপ ও অনাচারের প্রতি আকর্ষণ কমাতে বিকল্পসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলিম বিকল্প বিদ্যমান হওয়ার ভিত্তিতে শরিয়ার আদেশ পালন করে না। এমন নয় যে, বিকল্প পাওয়া গেলে শরিয়া পালন করবে আর না পাওয়া গেলে হারাম কাজে লিপ্ত থাকবে। সে যেন সব সময় মনে রাখে, সে আল্লাহর বান্দা। সে আছে পরীক্ষাস্থলে। আর আল্লাহ তায়ালা মহান ও উদার। তিনি যা হারাম করেন, তার বিপরীতে ভালো বিনিময় দান করেন।

সমাপ্ত

---

১. *আল-ইস্তিকামা*, ১/৩১৭

ইমরান রাইহান

গত শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুতে ইতিহাসপ্রেমী এই তরুণের জন্ম। পৈতৃক নিবাস নোয়াখালীতে হলেও বেড়ে উঠেছেন ঢাকায়। পড়াশোনা কওমি মাদরাসায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাট চুকিয়ে ব্যস্ততা হিসেবে বেছে নিয়েছেন লেখালেখি। মূল আগ্রহ ইতিহাসে হলেও প্রায়ই লেখেন জীবন-গঠনমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। সেখানেও থাকে ইতিহাসের ছোঁয়া। তার কলমের মুগ্ধতায় গড়ে উঠছে ইসলামি ইতিহাসপ্রেমী এক নতুন প্রজন্ম।

ইতিমধ্যে তিনি রচনা করেছেন ইতিহাস বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই। এর বাইরেও লিখেছেন ভিন্নধর্মী রচনা। সেগুলোতেও রয়েছে ইতিহাসের ছায়া ও ছোঁয়া। পাঠককে গদ্য ও বিষয়ে টেনে ধরার কিমিয়াটুকু তার লেখার সবিশেষ দিক।

ইতিহাস বিষয়ক বই: *আব্বাসি খিলাফাহ*, *ইতিহাসের খলনায়ক*, *ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা*, *পাইন বনের যোদ্ধা* ইত্যাদি

অন্যান্য বই: *নির্মল জীবন*, *মুশাজারাতে সাহাবা*, *মাহফিলে মাহফিলে*, *সালাফের জীবন থেকে*, *মুরিদপুরের পীর* ইত্যাদি।

মডার্নিজম ও পোস্ট মডার্নিজমের হাত ধরে গত দেড় শতাব্দী যাবৎ মুসলিমবিশ্বে ছড়ানো হচ্ছে নানা বিভ্রান্তি। কখনও ধর্মকে সরাসরি অস্বীকার করা হচ্ছে, কখনও এর সীমা প্রভাবকে সংকুচিত করা হচ্ছে, কখনও হাজির করা হচ্ছে শরিয়ার বিকৃত ব্যাখ্যা। নসকে উপস্থাপন করা হচ্ছে ভুলভাবে, কিছু ক্ষেত্রে করা হচ্ছে আড়াল। ফলে শরিয়ার যে চিত্র দাঁড়াচ্ছে, তা সালাফে সালেহিনের যুগে ছিল না; এমনকি হয়তো তারা এই চিত্র দেখলেও আঁতকে উঠতেন!